ছেলেটা আমাদেরকে সম্মানিত করে গেছে

মনোয়ারা বেগম*

আবু সাঈদ আমার চতুর্থ সন্তান। কিন্তু সব সন্তানের চেয়ে সাঈদ একটু অন্য রকম ছিল। স্কুল থেকে আসার পর তার খেলার দিকে কম মনোযোগ থাকতো, সর্বদা ঝোঁক ছিল পড়াশুনার দিকে।

প্রচন্ড অভাবের সংসার আমাদের। অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে। নুন আনতে ফুরায় অবস্থা। ওদের পড়ার খরচ যোগানো একরকম অসম্ভব ছিল। কিন্তু ছেলেটা পড়ালেখায় ভাল ছিল জন্য পেরেছে। ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পাওয়ায় ছেলের সুবিধা হয়েছিল। ও নিজের বৃত্তির টাকায় নিজের খরচটা চালিয়ে নিয়েছিল। আমরা ওর টাকায় হাত দিইনি।

ছেলেটা আমার উঁচা-লম্বা হওয়ায় পাড়া-প্রতিবেশীরা আমাকে বলত, ছেলেকে যেন আমি আর্মিতে চাকরির জন্য দিই। সাঈদ একথা শুনে বিরক্ত হয়। বলে, সে এসব চাকরি করবে না। আমার ছেলের ইচ্ছে ছিল, বড় অফিসার হবে। সেই ভাবে সে প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

ছেলেটা একটু আলাদা ধরণের। কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার সময় কিছু না কিছু নিয়ে আসত। খুবই সাধারণ কিছু, কিন্তু নিয়ে আসত। যেমন কখনও কলা, কখনও ডিম ইত্যাদি নিয়ে আসতো। বাড়িতে এসে কোন সমস্যা দেখলে সেটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। যেমন, বাড়ি এসে দেখল যে একটা গরু অসুস্থ, সাঈদ সেটা করার জন্য উদ্যোগ নিলো।

ছেলেটা আমার এতটাই ভাল ছিল যে, ওকে নিয়ে আমার কোন চিন্তা করতে হয়নি কখনও। আমার অন্য সন্তানদের নিয়ে খুব চিন্তা হতো, সাঈদকে নিয়ে তেমন কোন চিন্তা ছিল না। আমার মনে হয়েছিল, ওর কাজের অভাব হবে না।

সন্তানদের মধ্যে যাদেরকে নিয়ে চিন্তা করেছি, তারা আজ আমার কাছে আছে; আর যাকে নিয়ে কখনও চিন্তাই করিনি, সে-ই আজ নেই। সে-ই চলে গেছে! তাকে নিয়ে চিন্তা করি, ভাবি।

জীবন তো খুব ছোট, সবাইকে একদিন চলে যেতে হয়। জন্ম নিলে মানুষকে তো মরতেই হয়। আর, কোন না কোন ভাবে মানুষ মারা যায়। তবে আমার জন্য গর্বের যে, ছেলেটা আমাদের এই দেশের জন্য মারা গেছে। মানুষের জন্য সে মারা গেছে। আমার ছেলের মৃত্যু সাধারণ কিছু নয়।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছেলেটা আমাদেরকে সম্মানিত করে গেছে।

* শহিদ আবু সাঈদের মা

গরু বেচে সাঈদকে কলেজে ভর্তি করি

মোঃ মকবুল হোসেন*

আমার ছোট দুই ছেলের মধ্যে আবু হোসেন আর আবু সাঈদ পিঠাপিঠি। এরা একসাথে বড় হয়েছে। যখন তারা মাদ্রাসায় পড়ে, মুসলমানি তখনও হয়নি। স্কুলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণি পড়ার পরে জাফরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এসে ক্লাস ফোর এ ভর্তি হয়। সেখান থেকে ফাইভ এ বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়। অগ্রহায়ণ মাসে সে বৃত্তিটা পায় ট্যালেন্টপুলে।

বৃত্তির ঘটনাটা ছেলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় নতুন একটা ছেলে খালাসপীর থেকে এসে ভর্তি হয় ওর স্কুলে। ছেলেটা খুব ভালো ছাত্র ছিল। তার বাব-মা দুজনই শিক্ষক, তাদের ছেলে ভালো জামা-জুতা পরে স্কুলে আসে। আমি সাঈকে তেমন কিছু দিতে পারিনি। খুব সাধারণভাবে আমার ছেলে স্কুলে গেছে।

বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট হলো, সাঈদ প্রথম হয়েছে, ছেলেটা দ্বিতীয়। আমার ছেলে বৃত্তিটা পেল, ঐ ছেলেটা পেল না। সাঈদ তার বাড়িতে যেত, ছেলেটাও আমাদের বাড়িতে আসত। তারপর পড়ল খালাসপীর দ্বিমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ে। যেখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেছে। ভালো রেজাল্ট (গোল্ডেন জিপিএ ৫) নিয়ে পাশ করেছে।

পাশ করার পর ছেলে আমার রংপুরে গিয়ে কলেজে পড়তে চাইল। তাকে রংপুর শহরে রেখে পড়াশোনার মতো অবস্থা আমার ছিল না। তারপরও মত দিলাম। কারণ, ছেলের আগ্রহ খুব। আমারও বিশ্বাস ছিল, ও পারবে। কেননা, সাঈদ ছোটকাল থেকেই টিউশনি করত। আমার মনে হয়েছিল, একবার শুরু করতে পারলে ও পারবে।

এরপর সে রংপুর সরকারি কলেজ এ ইন্টারে ভর্তির সুযোগ পায়। আমি কী করি? ছেলের জন্য ওই সময় একটা গরু বিক্রি করে সেখান থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ওকে দেই। তারপর আর তেমন কিছু দেওয়া লাগেনি। বাড়ি থেকে চাল-ডাল, তরি-তরকারি নিয়ে যেত, ও টিউশনি করাত। এভাবে কলেজটা শেষ করে।

করোনার সময় এক বছর ছেলে আমার গ্রামে ছিল। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে ঢাকায় গেছে। সেখান থেকে যাবে গোপালগঞ্জে, ভর্তির ভাইবা দিতো। ওর টাকা দরকার। একদিন রাতে ফোন করেছে আমার কাছে। আমি তখনও একটা গরু বেচে ছিলাম। কত বেচে ছিলাম এখন মনে নাই।

সাঈদ ফোনে বলল, আব্বা গরু বেচেছেন? বলি, হ, বেচছি। ছেলে তখন বলে আমাকে এখনই ৬ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন। আমি বলি, রাতেই দেওয়া লাগবে, সকালে দেই, ছেলে আমার বলে, না, রাতোতেই দ্যান। আমি তখন একজনকে দিয়ে মোবাইলে টাকা পাঠাই। সেই টাকায় সে গোপালগঞ্জ যায়।

ছেলে আমার গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায়। সেখানে তার সিরিয়াল হয়েছিল ১৬। কিন্তু এতে আমাদের ভাবনা বেড়ে যায়। দূরের রাস্তা, আমরা অভাবী মানুষ, দূরে হলে তো পারব না। এগুলো চিন্তা।

---

* শহিদ আবু সাঈদ এর বাবা

ঐ সময়ে খবর আসে সাঈদ রংপুরেই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে সুযোগ পেয়েছে। এটা আমাদের জন্য ভালো হলো। তারপর সে রংপুরে ভর্তি হয়। ভর্তির সময়টা কার ব্যবস্থা করা যাচ্ছিল না। তখন আমার সামান্য একটু জমি ছিল। সেটা বন্ধক রেখে সাঈদের ভর্তির ব্যবস্থা করি।

ভর্তির পরে আজও খরচ দিতে পারিনি। ছেলে আমার টিউশনি করেই চলত। এমনকি টিউশনির টাকা বাঁচিয়ে অল্প-সামান্য টাকা বাসায় মাঝে দিত। ছোট বোন সুমিকে হাতখরচ দিত। ওর বোনের বিয়েতে কিছু দিয়েছিল। বাড়িতে আসলে গরুর ভুসি কিনে দিত। গরুর চিকিৎসা করতে টাকা দিয়েছিল। এভাবে সে টিউশনি টাকা দিয়ে সংসারে সহযোগীতা করেছে।

গত কোরবানির ঈদে ছেলে আমার শেষবারের মতো বাড়ি এসেছিল। ঈদের পরদিন সে যায় খালাসপীরের দিকে, মোনাইল গ্রামে এক বন্ধুর বিয়েতে। সেখানে আরও এক বন্ধুর বিয়ে। এই দুইটা বিয়ে খেয়ে বাড়ি আসে।

তখন বেলা তিনটার দিকে হবে। ব্যাগট্যাগ ঘাড়ে নিয়ে আমাকে বলে, আব্বা, মুই যাওছো। ঐ যে গেছে, সেই শেষ কথা। তারপর আর কথা হয়নি। ভাই-বোনদের সাথে কথা হয়েছিল। ওদেরকেই বলত সবকিছু।

ছেলেকে কখনও মারধর করিনি, পড়ার জন্য কখনও বলতে হত না। সাঈদ নিজ আগ্রহেই পড়ত। স্কুল থেকে এসে মাঠে কাজ করত। কৃষিকাজ করার সময় সাঈদ ছিল একজন 'তুখোড় কৃষক'। সবার চেয়ে বেশি কাজ করত।

ছেলেটা আমার অত্যন্ত শান্তশিষ্ট স্বভাবের ছিল। কখনো জিদ করতোনা। কোনকিছুর জন্য বায়না ধরত না। কেননা সে বুঝত যে, দিতে পারব না।

আমাদের খুব অভাব ছিল। খুব কষ্টের দিন গেছে আমাদের। তারপরও ছেলেমেয়েদের কষ্ট দিইনি। কখনও ভাতের কষ্ট পায়নি আমার সন্তানেরা।

ছুটিতে বাড়িতে আসলেও সাঈদ বসে থাকত না। গ্রামে সামাজিক কাজকর্ম নিয়ে থাকত। স্থানীয় সংগঠনগুলোর সাথে সে ঈদের সময়ে দরিদ্র মানুষদের লাচ্চা-চিনি ইত্যাদি দিত। শীতের সময় কম্বল বিতরণ করেছে। খেলাধুলার দিকে নজর ছিল না। ও কখনও আড্ডা দিয়ে বেড়ায়নি।

আমার ভাই আবু সাঈদ

সুমি খাতুন*

কোটাসংস্কার আন্দোলনের একজন সাহসী যোদ্ধা ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সমন্বয়ক শহিদ আবু সাঈদ। তিনি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ছিলেন এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। আবু সাঈদ একজন সাধারণ ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অদম্য স্পৃহা তাকে অসাধারণ করে তুলেছিল। তিনি কোটাসংস্কার আন্দোলনের একজন একজন গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়ক ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে রংপুর অঞ্চলে আন্দোলন বেগবান হয়েছিল। ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহত হন আমার ভাই। তাঁর আত্মত্যাগ পরিবার ও পৃথিবীব্যাপী কোটি জনতার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। আমি তার ছোট বোন, আমার সাথে শৈশবকাল থেকে বেড়ে ওঠা পর্যন্ত অনেক স্মৃতি রয়েছে। যা আমার হৃদয় মাঝে বিরাজ করে।

শৈশবকাল ছিল অনেক সুন্দর। আমরা ভাই, বোনের সবাই সবার থেকে দুই বছরের ছোট ছিলাম। আমরা কেউ কারো সাথে ঝগড়া করতাম না। আবু সাঈদ ভাইয়ার সঙ্গে খাবার নিয়ে আমি ঝামেলা করতাম। আবু সাঈদ ভাইয়া যেকোন খাবার যেটা বেশি ভালো সেটা আগে নিয়ে নিত যেমনঃ বাবা যেকোন ফলমূল বাজার থেকে আনলে বা মিষ্টিজাতীয় যেকোন জিনিস, সবার আগে যেটা ভালো তা হাতে নিত বা আমার থেকে বেশি নিত। আমি তখন কান্না করতাম। আমি কান্না করলেও ছোটবেলায় আমাকে কোনো জিনিস ফেরত দিত না, নিয়ে দৌড় দিত। আমি তখন আব্বা বাড়িতে আসুক, বলে দিব তুই বেশি খাইসিস। আর বড় হওয়ার পর তার উল্টোটা করে। ভালোটা আমার জন্য রাখে আর নিজে খারাপটা খায়। ছোট থেকে আবু সাঈদ ভাই সাহসী এবং বুদ্ধিমান ছেলে হিসেবে পরিচিত। ছোট থেকে তার পরিবারের প্রতি ছিল অগাধ ভালোবাসা। কম বয়স থেকে মা-বাবাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করত।

আবু সাঈদ ভাইয়ার প্রথম শিক্ষাজীবন শুরু হয় মায়ের হাত ধরে। আমাদের বাবা-মা কিন্তু লেখাপড়া বিষয়ে অজ্ঞ। তবুও আমাদের সবাইকে স্কুলে পাঠায় দিত। তো আবু ভাইয়া জীবনে প্রথম যেদিন স্কুলে যায়, সেদিন মা নিজে রাখি আসছিল। সেদিন থেকে আর কোনোদিন ভাইয়াকে স্কুলে যাইতে বলা বা রাখি আসা লাগেনি। ঐ স্কুলে একজন ম্যাডাম ছিল ওনার নাম মাহমুদা পারভীন, আবু সাঈদ ভাইয়ার ছোট বেলা লেখাপড়া শিখাতে যতটা অবদান ম্যাডামের আছে তার থেকেও কম অবদান আমার মা-বাবার আছে। ঐ ম্যাডাম আবু সাঈদ ভাইয়াকে এত ভালোবাসতো যে, তার লেখাপড়া করার জন্য খাতা কলম পর্যন্ত কিনে দিছে। তার শিক্ষাজীবনে সব স্যার ম্যাডাম অনেক ভালোবাসত। কিন্তু মাহমুদা পারভীন ম্যাডামের অবদান ছিল অন্যরকম। আমাকে একদিন বলছিল জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে ম্যাডামের জন্য কিছু গিফ্‌ট নিয়ে তার কাছে যাব। তার এতটা লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল যে, আমি কোনোদিন মা-বাবাকে বলতে শুনি নাই যে পড়তে বস। ভাইয়ার নিজের ইচ্ছায় নিয়মিত স্কুল যেতো এবং বাসায় পড়তো। আবার আমার কৃষিকাজ করায় মাঠে সাহায্যে করতো। এমন কোনোদিন হতো যে, মাঠ থেকে এসে স্কুলে যেত। এভাবে পড়তে পড়তে ভাই যখন ক্লাস ফাইভ এ বৃত্তি পরীক্ষা দেয়, তখন তার রেজাল্ট হয় গোল্ডেন A^+। টেলেন্টপুল বৃত্তি। তখন

---

* শহিদ আবু সাঈদের ছোট বোন, সেমিনার এটেনডেন্ট, বেরোবি, রংপুর

পরিবারের সবাই খুশি হয়। প্রতিবেশীরা বলে যে মা-বাবা লেখাপড়ার কিছুই জানে না, তার ছেলে দেখও কিরকম মেধাবী। তারপর শুরু হয় তাঁর মাধ্যমিক এর জীবন।

ভাইয়া মাধ্যমিক পড়েন খালাশপীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ওখানে যাওয়ার পর যাতায়াতের কষ্ট হওয়ার কারণে বাবার কাছ থেকে একটি সাইকেল আবদার করে নিয়েছিল। সেটা দিয়ে ভাইয়া হাইস্কুলে যাতায়াত করেছে। সেখানে গিয়ে তার অনেক কয়েকজন ভালা বন্ধু হয়েছিল। ওরা ভাইয়াকে খুব ভালোবাসতো। তারা ছিল অনেক বড় পরিবারের। তাদের মা-বাবা চাকুরি করত। কিন্তু তার বন্ধুরা বড় পরিবারের হলেও তাকে কোনোদিন ছোট করে দেখেনি। তাদের মন মানসিকতা অনেক ভালো ছিল। ভাইয়াও ভালো লেখাপড়ায়। পাড়ায় তাকে স্যার ম্যাডাম থেকে সবাই ভালো বাসতো। ভাইয়ার কয়েকজন বন্ধুর নাম- কনক, শিশির, ফরহাদ, রাসেল, খায়রুল, রিয়াজুল, মতিয়ার, মেহেদী, আজিজুল আর ও নাম না জানা অনেকে। এরা সবাই মাধ্যমিক এর বন্ধু। ভাইয়ার কঠোর পরিশ্রমের কারণে ক্লাস এইটে A^+ পায়। তখন থেকে আমাদের পরিবারের ভাইয়ার প্রতি আশা জন্মায় যে সে অনেক মেধাবী। ভালোভাবে লেখাপড়া করে অনেক ভালো কিছু হবে। ভাইয়া যখন এস.এস.সিতে গোল্ডেন A^+ পেয়েছিল তখন আমি দেখেছি কতটা পরিশ্রম করেছে। আমি প্রায় বাচ্চাদের মা-বাবাকে দেখি যে পরীক্ষার সময় ভালো খাবার নিয়ে রাখে। যাতে বাচ্চারা ভালোভাবে খাইতে পারে, কিন্তু ভাইয়ার জীবনে তা হয়নি। বাবা যা জোগাতে পারছে, তা দিয়েই খাইছে। কোনোদিন ভালো খাবারের জন্য আবদার করেনি। আর পরীক্ষার দিন খাবারের সময় পাইতনা। আর তার কঠোর পরিশ্রমের ফল হচ্ছে গোল্ডেন A^+। তখন তার প্রতি আমাদের পরিবারের আশাটা আরো বৃদ্ধি পায়। বাবাতো খুশিতে সবার কাছে ভাইয়ার কথা বলত। আর আমি দেখেছি তার কতটা আনন্দের জল আসত।

ভাইয়া ছোটবেলায় কুরআন পড়া শিখেছেন। ছোট থেকে নামাজ কালাম পড়ে। এমনকি আমি আমার বোজার বয়সে ভাইয়াকে রমজান মাসে একটি রোজাও কাজা করতে দেখিনি। আমার মনে পড়ে একবার রমজান মাসে ধানের কাজ শুরু হওয়ার কারণে ভাইয়ার রোজা থাকতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল। তার পরেও ভাইয়ার রোজা ভঙ্গ করেনি। ভাইয়া পবিত্র মক্কা শরিফে যেভাবে নামাজ পড়ে ঠিক সেইভাবেই নামাজ আদায় করত। আমার জানা মতে ভাইয়া আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ এর ওয়াজ শুনত। বড় ভাইদেরও আগে আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা) এর সুন্নত দাড়ি রেখেছিলেন। তিনি মেসে সিদরাতুল মুত্তাকিমনামে বই পড়ত। ইসলামের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ও ঈমান ছিল তার।

প্রাইমারি লেখাপড়া শেষ করে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে টিউশনি শুরু করেন ভাইয়া। এই টিউশনির টাকা দিয়ে ভাইয়া নিজের লেখাপড়ার খরচ চালায়। লেখাপড়া খরচের পাশাপাশি ভাইয়া নিজের বন্ধুদের মেশার জন্য নিজের গায়ের জামাও ক্রয় করে। বাবার বয়স হওয়ার কারণে তার কাছ থেকে সেরকম কোনকিছু চাইত না। আমি দেখেছি অনেক ছেলে-মেয়ে তাদের বাবার কাছ থেকে ২০-২৫ হাজার টাকা ফোন আবদার করে। কিন্তু ভাইয়া পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে ভালো শার্ট, প্যান্ট আবদার করতে পারেনি। সে তার স্টুডেন্ট জীবন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল। দরিদ্রতার সাথে লড়াই করে পরিবারের লোকদের মুখে একঝলক ফোটানার অনেক চেষ্টা ছিল তার। কিন্তু আল্লাহ পাকের কী ইচ্ছা একটি যৌক্তিক দাবি তার এবং পরিবারের সকল স্বপ্ন একনিমেষেই শেষ হয়ে যায়।

কলেজ জীবনে লেখাপড়া করেন রংপুর সরকারী কলেজে। সেখানে লেখাপড়া করার সময় ভাইয়া শুধু বাড়ি থেকে চাল নিয়ে এসেছিল। কলেজের লেখাপড়াটাও ভাইয়া টিউশনি করে চালাইছে। তার মধ্যে এস.এস.সি গোল্ডেন A^+ পাওয়ায় ঢাকা ব্যবিলন গ্রুপ থেকে একটা লিখিত পরীক্ষার সুযোগ পায়। সেখানে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রতি মাসে ভাইয়া টাকা পাইত যা দিয়ে ভাইয়া অনেক উপকৃত হইছে। ওই সময় কলেজ থেকে ভাইয়া একটা স্কলারশীপ পেয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করাটা একান্ত তার ব্যক্তিগত চেষ্টার মধ্যে দিয়ে হয়েছে। কেননা আমার মা-বাবা বিশ্ববিদ্যালয় কী তাই জানত না। আর তাকে পড়তে বলবে কী। ভাইয়া কোনো কোচিং বা টিউশনি ছাড়াই নিজের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পায়। এখানে ভাইয়া বাচ্চাদের বাসায় পড়াত এবং কোচিং এর ক্লাস নিত। এত কষ্ট করে লেখাপড়ার করার কারণে ভাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসেও একটা নতুন টাচফোন কিনতে পারেনি। এত কষ্ট করে লেখাপড়া করার পরেও আবার টিউশনির টাকা বাড়িতে দিয়ে সাহায্য করত। তিনি ছিলেন সংগ্রামী জীবনের অন্যতম নায়ক।

নিজের খরচ চলার পাশাপাশি বিভিন্নভাবে পরিবারকে সাহায্য করেছিল যেমন: আমি যখন জাফর পাড়া কামিল মাদ্রাসায় দশম শ্রেণিতে পড়ি, তখন আমার লেখাপড়ার খরচ বেড়ে যায়, বাবার কাছে চাইতে সংকোচ করতাম। তখন ভাইয়া ইন্টারে পড়ত তখনই ভাইয়া আমার লেখাপড়ার জন্য যা কিছু লাগে জাফর পাড়া বাজারে রিজার্ভ করে দিয়েছিল। আমাকে আরো অনেকভাবে সাহায্যে করেছিল। মা যদি অসুস্থ হইতো রংপুর থেকে ছুটে গিয়ে মাকে ডাক্তার এর কাছে নিয়ে যেত। নিজের টিউশনির টাকা দিয়ে মাকে ঔষধ কিনে দিত। রমজান মাসে মা-বাবাকে ভালোমন্দ খাওয়ার জন্য টাকা দিতো। আর তার ভাগ্না-ভাগ্নির প্রতি ছিলো অগাধ ভালোবাসা। খাবার জিনিস বাদ দিয়েও তাদের জন্য নতুন গায়ের জামা কিনত। যে মানুষটা টিউশনির টাকায় এত কিছু করতে পারে, আবার বাড়িতে আসলে মা-বোনকে জিজ্ঞেস করতো কিছু খাবে নাকি। তাহলে সে লেখাপড়া শেষে বড় কোন জায়গায় দাঁড়ালে কি করতো।

ভাইয়া ছোটবেলা থেকে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া করার কারণে আমার ভাইয়ের প্রতি অনেক আশাবাদী ছিলাম। আমরা ভাবছিলাম জীবনে অনেক বড় কিছু একটা হবেই যেমন: শিক্ষা ক্যাডার, বিসিএস ক্যাডার বা বড় কোনো অফিসার আমাদের পরিবারের কেউ এতদূর পর্যন্ত লেখাপড়া করে আসতে পারেনি। কঠোর পরিশ্রম ও মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ভাইয়া এই জায়গায় পৌঁছেছিল। ভাইয়ার বন্ধুরা যখন ভাইয়াকে তাদের বাবার মোটরসাইকেলে বাড়ি থেকে নিয়ে যেত তখন আমি ভাবতাম ভাইয়ারও একদিন এইরকম গাড়ি হবে। আমরা গরিব বলে অনেক জায়গায় অবহেলিত হইছি। কিন্তু মহান আল্লাহ আবু সাঈদ ভাইয়ার মধ্যে দিয়ে অনেক আগে থেকে আমাদের পরিবারকে সম্মানিত করেছিল। আমার বাবা মারা যাওয়ার আগে একটা ইচ্ছার কথা বলেছিল। সেটা হচ্ছে তার মৃত্যুর আগে যেন আবু সাঈদ ভাইয়ার একটা চাকুরি হইছে সেটা দেখতে পায়। তাহলে তার আত্মা শান্তি পাবে। তাহলে কতটা কষ্ট লাগবে যদি সেই সন্তানই তার সামনে লাশ হয়।

মেস থেকে বেশি বাড়িতে আসত না ভাইয়া। তার কারণ হচ্ছে টিউশনি করাত। প্রয়োজন পড়লে বৃহস্পতিবার বিকেল বেলা আসত। আবার শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা চলে যেত। ধানের কাজের সময় এক/দুই দিন এসে থেকে বাবাকে কাজে সাহায্যে করত। এছাড়া ঈদে বাড়িতে এসে কয়েকদিন থাকত। ঈদে বাড়িতে আসলে ভাইয়া তাঁর হাইস্কুলের বন্ধুদের সাথে সময় কাটাত। বাড়িতে আসলে মাকে তেমন কোনো রান্না করতে বলতো না, যা জুটত তা দিয়েই ভাত খেয়ে চলে যেত।

সবজির মধ্যে সব সবজি ভাইয়া পছন্দ করত। ছোটবেলায় ভাইয়া ইচ্ছা করে মিষ্টি কুমড়া আর বেগুন খাইত না। মাছ-মাংস বেশি পছন্দ করত। ভাইয়ার বেশি পছন্দের খাবার ফল-মূল। আম-কাঁঠাল বেশি পছন্দ করত। পিঠা পায়েস পছন্দ করত। কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে কখনও পিঠা তৈরী করতে বলত না।

ভাইয়া কেন আমাদের গোষ্ঠীর কেউ কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কখনও যুক্ত ছিল না। আমার ছোট থেকে দেখে আসতেছি, আমরা বাবা কোন দলাদলি করতেন না।

আর, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা যে আমার ভাইয়া নিজের দলের লোকের হাতেই মারা গেছে বা ছাত্রশিবির করত। অতএব আমাদের পরিবার থেকে দাবি হচ্ছে ভাইয়াকে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়াবেন না।

ভাইয়া কুরবানি ঈদের দুদিন আগে বাড়িতে এসছিল। বাড়িতে আসার পর ফোন করে ভাইয়া আমাকে ঈদের দাওয়াত দেয়। ঈদের দিন কুরবানি শেষে খাওয়াদাওয়া করার পর আমার বাড়িতে আসে। এসে আমার মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে দোকানে চলে যায় মজা কিনে দেওয়ার জন্য। দোকান থেকে বাড়িতে এসে আমার সাথে ভালোমন্দ কথা বলার পর আমি খাইতে বললে বলে যে আমি মমতা আপার বাড়িতে খাইছি। তখন আমি কিছু আম খাইতে দেই। ভাইয়া কিন্তু আম খুব পছন্দ করত। তারপর বাড়িতে আসার সময় বলে তুই কিন্তু কাল সকালে আসিস। ঈদের পরের দিন ভাইয়া তার হাইস্কুলের বন্ধু কনক ভাইয়ার বিয়ে খাইতে যায়। পরে সেই জায়গা থেকে আসে রাত ১০.০০টার দিকে। পরে ভাই-বোন মিলে অনেক কথা বলাবলি ও হাসাহাসি করি। পরের দিন সকালে আমাদের কিছু ধান সিদ্ধ করা ছিল যেগুলো আমি ও ভাইয়া আমাদের পাশের বাড়ির আঙিনায় নেড়ে দেই। তখন বৃষ্টি হওয়ার কারণে ধানগুলো নষ্টের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। তখন ভাইয়া মাকে বলেছিল ধান সিদ্ধ করলে আমার কাছে ফোন দিবে। কারণ হচ্ছে এখন আবহাওয়ার খবর জানা যায় আজ থেকেই কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হবে।

কুরবানি ঈদের দুই দিন পরে আমি আর ভাইয়া আমার মেয়েকে ডাক্তার দেখানোর জন্য পীরগঞ্জ নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার দেখানোর পর ভাইয়া আমাকে বলল তুই কখনো পীরগঞ্জ সুইজগেট গেছিলি। আমি বললাম না। তখন ভাইয়া বলল চল ঘুরে নিয়ে আসি। আর বলল যে মাঝে মাঝে ঘুরতে বের হতে হয়। তাহলে মন ভালো থাকে। তখন আমি ভাইয়ার কাছে রংপুর চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়ার আবদার করলাম, তখন ভাইয়া বলল ঠিক আছে তোকে একদিন সময় করে নিয়ে যাব।

সেদিন সকাল বেলা মা ধান সিদ্ধ করেছিল। আমরা দুই ভাইবোন সেগুলো বস্তা করে অন্য বাড়িতে রোদে দেই। সেদিন যে ভাইয়া সকাল বেলা কী সবজি দিয়ে ভাত খাইছিল তা আমার খেয়াল নাই। কিন্তু দুপুর বেলা মিষ্টি কুমড়া ও গরুর হাড্ডি দিয়ে রান্না করেছিলাম, আমি তা দিয়ে দুপুরের খাবার খাই। এবং দুপুর ২.৩০ দিকে আব্বা-মাকে বলে আমার হাতে দুইশত টাকা দিয়ে রংপুর চলে আসে। আমি টাকাটা দেওয়ার সময় বলেছিলাম না লাগবে না। তোমার চলার মতো টাকা আছে, তখন বলে আছে। তুই এটা নে। এতকিছুর মাঝে এই দুইশত টাকা আমার কাছে অনেক মূল্যবান।

আমি গর্বিত, আমি তার ছোট বোন। ভাই হিসেবে তিনি ছিলেন অনেক স্নেহশীল, আমাকে রাখতে চেয়েছিল পরমযত্নে। সে আমাদের জাতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। কত সাধারণ থেকেও ব্যক্তিত্ব ছিল সবার সেরা। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে তার আত্মমর্যাদাবোধ ছিল অনেক বেশি। আজকে যে সম্মান

তিনি তার পরিবারের জন্য রেখে গেছেন, তা শুধু আজকের নয়, তার শিক্ষাজীবন শুরু থেকে একটু একটু করে বয়ে এনেছে। তিনি বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী প্রকাশ পাওয়ায় তার পরিবারকে অনেক আগে থেকে অনেক প্রভাবশালী লোক সম্মান দিত। এই সম্মান আজ বহুগুণে বেড়ে গেছে। মেধার যুদ্ধে বৈষম্য আর অনিয়মের বিরুদ্ধে নিজের বুক টান করে দাঁড়ায় হায়ানাদের সামনে। সেই হিংস্র হায়েনারা শেষ পর্যন্ত গুলি চালায় তার বুকে। তিনি তার মূল্যবান জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন অন্যায়ের সামনে মাথা নত করা জাতি আমরা নই। এই মহান ব্যক্তির মূল্যবান জীবন ত্যাগ আমরা যেন কখনো না ভুলি। তাই তার আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে প্রতিবছর ১৬ জুলাই শহিদ আবু সাঈদ দিবস হিসেবে পালন করব। এই দিনটি যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে যেকোন সরকার থাকাকালীন পালন করা হয়। মহান আল্লাহ যেন আমার ভাইকে শহিদ হিসেবে কবুল করে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন, আমিন।

ভেবেছিলাম সাঈদ একদিন বড় সরকারি কর্মকর্তা হবে

আবু হোসেন*

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রথম শহিদ আবু সাঈদ আমার ছোট ভাই। আমি আবু সাঈদের বড়। আমাদের বয়সের ব্যবধান বেশি না। আমি ওর থেকে দুই বছরের বড়। ভাই বোনদের মধ্যে আবু সাঈদই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল।

কথায় বলে, 'মানুষের ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়'। তার বাস্তব উদাহরণ আমি দেখেছি ছোট ভাইটার জীবনে। তার ছিল প্রবল ইচ্ছাশক্তি, বড় হবার ইচ্ছা। লেখাপড়া করার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছে শক্তি থেকেই আবু সাঈদ এত দূরে এসেছিল।

২০১০ সালে আবু সাঈদ জাফর পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শেষ করে। আমাদের অল্প কিছু কৃষি জমি আছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি আমরা দু'ভাই বাবাকে কৃষিকাজে সহযোগিতা করতাম। মাঠের কাজে ওর সাথে কাজ করে আমরা পারতাম না। লেখাপড়ায় যে রকম মেধাবী ছিল, কাজকর্মে ও খুব চালু ছিল।

আমি জাফরপাড়া কামিল মাদ্রাসা থেকে আলিম পাস করি। তারপর অনার্সে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু পড়ালেখা শেষ করতে পারিনি। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে অল্প কৃষি জমি দিয়ে আমাদের পারিবারিক চাহিদা পূরণ হতো না। বাবা লেখাপড়ার খরচ দিতে পারতো না সেভাবে।

কিন্তু সাঈদ থেমে থাকেনি। সে যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে ওঠে, তখন থেকেই ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে পড়াতে শুরু করে। তার টিউশনির ফিসও ছিল অল্প, মাসিক ১০০ টাকা। এই টাকায় তার কাছে গ্রামের বাচ্চারা পড়ত। এভাবে শুরু হয় তার সংগ্রামী জীবন। খালাসপীর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জেএসসি এসএসসি পাস করে সে।

আমরা দু'জনে এক সাথেই বড় হয়েছি। সব কিছুই একসাথে করতাম। খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা সব একসাথে। বাবার সাথে কৃষি কাজে মাঠে গিয়ে কাজের সহযোগিতা করতাম আমরা ।

২০১৮ সালে রংপুর সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে। তারপর শুরু হয় ওর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার যুদ্ধ। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় আবু সাঈদ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়। ১২ তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিল সে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে আমরা তাকে নিয়ে স্বপ্ন বুনতে থাকি। ভাইটা আমাদের আশার আলো হিসেবে আবির্ভূত হয়। ভেবেছিলাম, আমরা তো কেউ সেভাবে লেখাপড়া করতে পারিনি আবু সাঈদ আমাদের পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবে। সরকারি বড় কর্মকর্তা হবে। একদিন আমাদের জীর্ণ বাড়িটায় আলো জ্বলবে।

বলতে গেলে আবু সাঈদ একা চলেছে। আমি বড় ভাই হিসেবে সেভাবে ওর পাশে দাঁড়াতে পারিনি। আমার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছি সাহায্য করার জন্য। তবে ভাই আমার সহজে কারো কাছে কখনও টাকা পয়সা চাইতো না। যখন একেবারে আটকে যেতো, আর উপায় থাকত না, তখন প্রকাশ করত। বলতো, ভাই আমার কিছু টাকা লাগবে। তখন ওকে আমি টাকা দিয়ে সহযোগিতা করতাম।

আবু সাঈদ আর সবার মতন ছিল না। অসাধারণ এবং সবার চেয়ে আলাদা ছিল সে। কাউকে কষ্ট না দিয়ে সব সময় নিজে নিজে চলার চেষ্টা করত। কারো কাছে কোন কিছু চাইতো না। সবর করত, নিজের কষ্টটা নিজে হজম করত।

* **শহিদ আবু সাঈদের বড় ভাই,** বাবনপুর, পীরগঞ্জ, জেলা রংপুর।

আমি সোশ্যাল মিডিয়া, ফেসবুকে দেখতাম সে মাঝে মাঝে অনেক সুন্দর সুন্দর এবং দরকারী লেখা লিখত। প্রতিবাদ করে লিখত। এতে ওকে আমি সব সময় উৎসাহিত করতাম। তারপরও সামাজিক বাস্তবতার কথা ভেবে, একজন বড় ভাই হিসেবে তাকে আমি সতর্ক হয়ে চলার জন্য বলতাম।

২০২৪ সালে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সাঈদ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। আমি তখন একটা চাকুরি সূত্রে বাইরে থাকি। একদিন ফেসবুকে দেখি, ও আন্দোলন করছে। এতে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। ওকে ফোন করি, এবং ফোনে খোঁজখবর নিতে থাকি, সাবধানে থাকতে বলি।

তবে ভাই যে আমার সমন্বয়ক ছিল, সেটা আমি জানতাম না, বা খেয়াল করে দেখিনি। আমার চাচাতো ভাই রুহুল আমিন ভাইয়ের সাথে ও একই মেসে থাকত।

ফেসবুকে ওদের পোস্টগুলো দেখে দেখে আমার টেনশন বাড়ে। আন্দোলন চলাকালীন জুলাই মাসের ১৩ ও ১৪ তারিখ উদ্বেগ জানিয়ে তাকে এসএমএস (খুদে বার্তা) করেছিলাম। বলেছিলাম সাবধানে থাকার কথা। কিন্তু দুই দিনই আমাকে রিপ্লে দেয়, 'চিন্তা করেন না'। দুই দিনই একই রকম উত্তর।

যেহেতু রুহুল আমিন ভাই আর আবু সাঈদ একই মেসে থাকত, ভাইকে বলেছিলাম, আবু সাঈদ কে আপনি দেখে রাখেন। রুহুল আমিন ভাই উত্তরে বলেছিলেন, কোন চিন্তা কইরো না। আমি আছি, আমরা এক সাথেই আন্দোলনে যাই।

আমি এ রকম হবে কখনো কল্পনাও করিনি। ১৬ই জুলাই ২০২৪ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আবু সাঈদ শহীদ হওয়ার খবর আমি আনুমানিক ৩:৩০ মিনিটে পাই। ওর মৃত্যুর খবর শুনে আমি দিশেহারা হয়ে যাই। আমি তখন টাঙ্গাইল থাকতাম। খুব দ্রুত বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেই। বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাই দশটার দিকে। বাড়িতে গিয়ে দেখি এক মর্মান্তিক দৃশ্য। দেখি, আমার ছোটভাই আবু সাঈদের জন্য চলছে হাহাকার আর সবার বুকফাটা কান্না।

পরের দিন সকাল বেলা আনুমানিক সাড়ে নয়টার দিকে আবু সাঈদের দাফন কাজ সম্পন্ন করি। তবে তার দাফন-কাফনের ব্যাপারে প্রশাসনিকভাবে আমাদের উপর অনেক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কত যে বাধা-বিপত্তি ! তা সত্ত্বেও জানাজা সুষ্ঠূভাবে সম্পন্ন করি। অতপর বাড়ির আঙিনায় পারিবারিক কবরস্থানে তাকে আমরা দাফন করি।

এই উঠোনে আমরা ছোট্টকালে খেলেছি। সেখানে ছোট্ট একটা বাঁশঝাড়ের নীচে, কাঁঠাল গাছের ছায়ায় আমার ছোট ভাইটিকে শুইয়ে রাখি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমার ভাইকে শহিদ হিসেবে কবুল করেন। খুব ছোট থেকে সে কষ্ট করেছে, তার ছোট্ট জীবনের গোনাহগুলো যেন ক্ষমা করে দেন। শহীদ হিসেবে জান্নাতের উচ্চ স্থান যেন তাকে দান করেন।

আমরা গ্রামের অতি সাধারণ মানুষ। আমাদের মতো পরিবারের একজন যুবক বৈষম্যহীন দেশ গড়তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, এটা আমাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায়, আবু সাঈদের জীবনদান স্বার্থক হয়েছে। তার শহীদ হবার পরে মানুষ রাজপথে নেমে এসেছে, দেশ থেকে ফ্যাসীবাদের পতন হয়েছে।

আমার জন্য এটা বড়ই আনন্দের যে, ছোটভাই আবু সাঈদ এখন মুক্তি ও বিপ্লবের প্রতীক। তার আত্মত্যাগ মানুষকে ন্যায়ের জন্য লড়াই করার অনুপ্রেরণা তৈরি করেছে। ইনশাআল্লাহ, আগামীতেও পৃথিবীজুড়ে শহীদ আবু সাঈদ বেঁচে থাকবে বিপ্লবের এক অনন্য প্রতীক হিসেবে।

মর্গে ঢুকে দেখি আমার ভাইয়ের নিথর দেহ !!!

রুহুল আমিন*

রংপুরে কোটাসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন আবু সাঈদ। পুলিশের তাক করা অস্ত্রের বিপরীতে বুক পেতে দাঁড়িয়ে যান আবু সাঈদ। আবু সাঈদ আমার জ্যাঠাতো ভাই, ইংরেজি বিভাগের ছোট ভাই, মেসমেট এবং জুলাই সহযোদ্ধা। আমি তাঁর চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। তবে বড় হলেও একসঙ্গেই আমাদের বেড়ে ওঠা। পীরগঞ্জের বাবনপুর গ্রামে আমাদের বাড়ি। আমাদের দুজনের বাবাই বর্গাচাষি। ছোটবেলায় দেখতাম, বাবা-জ্যাঠারা অন্যের জমি চাষ করে। যে ফসল পেতেন, তার বড় একটা অংশ সার-বীজ কিনে আর জমির মালিকের ভাগ দিতে দিতেই চলে যেত। এজন্য প্রায় সময়ই তাঁদের দিনমজুরি খাটতে হতো। পরিবারের অন্য সদস্যদের মতো আমি আর সাঈদও দিনের পর দিন মাঠে কাজ করেছি। ভোরে উঠেই খেতে চলে যেতাম আমরা, সকাল নয়টা পর্যন্ত কাজ করে বাড়ি ফিরতাম। ঘরে যা জুটত, তা-ই মুখে দিয়ে স্কুলে যেতাম। স্কুল থেকে ফিরে আবার ক্ষেতের কাজে লেগে পড়তাম। ক্ষেতে কাজের কারণে আমরা বেশি খেলাধুলার সময়ও পেতাম না। এক পোশাকে দু'তিন বছরও পার করেছি। সেই শৈশব থেকেই জানতাম, আমাদের ভাগ্য বদলের জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। খেয়ে না-খেয়ে হলেও পড়াশোনা করতে হবে, ভালো চাকরি করতে হবে, পরিবারের হাল ধরতে হবে। আমাদের গ্রামের প্রাইমারি স্কুল থেকেই পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি পায় সাঈদ। ক্লাস সিক্সে ওঠার পর গ্রামেই একটি টিউশনি জোগাড় করে। টিউশনির ১০০ (একশত) টাকা আর ওই বৃত্তির টাকা দিয়েই খাতা-কলম কিনত এবং পরীক্ষার ফি দিত। আমার বড় ভাই ততদিনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। ভাই বাড়িতে এলেই বইখাতা নিয়ে তার কাছে বসে পড়ত সাঈদ। ইংরেজি পড়ত। অনেক সময় তার পাশে আমিও বসে যেতাম। এসএসসি পাশের পর সাঈদ যখন রংপুর সরকারি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়, আমি তখন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে পড়ি। সাঈদকে শহরের একটি মেসে তুলে দিই। এক সময় অর্থের অভাবে ওর পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার জোগাড় হলে অনেক কষ্টে একটা টিউশনির ব্যবস্থা করি। সেই টিউশনির টাকায় নিজের ব্যয়ভার মেটানোর পাশাপাশি মা-বাবাকেও সহযোগিতা করতে থাকে সাঈদ। আবু সাঈদ ছিলেন কোটাসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক।

পড়াশোনা বাদ দিয়ে চলে গেল গ্রামে। সাঈদের প্রতি ওর পরিবারের প্রত্যাশা কতটুকু, আমি জানতাম। ওরা ৯ ভাইবোন। অভাবের কারণে বড় চার ভাইবোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ও শেষ করতে পারেনি। সাঈদের পিঠাপিঠি ভাই আবু হোসেন এইচএসসি পাশ করে পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়। তাই আবু সাঈদকে ঘিরেই ছিল পরিবারের সবার আশা-ভরসা। সাঈদও তাদের মান রাখতে চেষ্টা করে যেতে থাকে। ছোট বোন সুমিকে পড়াশোনা করাতে এগিয়ে আসে। এইচএসসি পাশ করার পর ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকে আবু সাঈদ। আমার কাছে এসে কথায় কথায় বলত, ভাই, আমরা গরিব মানুষের ছেলেপুলে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। কিন্তু বিধিবাম। প্রথমবার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই ওর সুযোগ হলো না। ভেঙে পড়ল সাঈদ। রংপুর ছেড়ে গ্রামে চলে গেল। ক্ষেতখামারে কাজ করতে থাকল। সিদ্ধান্ত নিল আর পড়াশোনা করবে না।

---

* শহিদ আবু সাঈদের জ্যাঠাতো ভাই। ইংরেজি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

একদিন গ্রামে গিয়ে ওর সঙ্গে বসলাম। দীর্ঘ সময় ধরে বোঝালাম। দ্বিতীয়বার ভর্তি প্রস্তুতি নিতে বললাম। নিজের ওপর নিজের চাপা ক্ষোভ গলতে থাকল। কোচিং করার টাকা নেই। বাড়িতেই পড়াশোনা শুরু করল। এবার আর ব্যর্থ হলো না সাঈদ। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেল। বেছে নিল বাড়ির কাছের রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। কাকতালীয়ভাবে আমার ইংরেজি বিভাগেই ভর্তি হলো। ভর্তির দিন সাঈদকে সঙ্গে করে ক্যাম্পাসে নিয়ে গেলাম। সব দাপ্তরিক কাজ শেষ করে দুজনে আমার মেসে এলাম। পরের চারটি বছর সাঈদ আমার মেসেই ছিল। সাঈদের সঙ্গে আমার ছয় সেমিস্টারের পার্থক্য। এজন্য অনার্সের কোনো বই তাকে কিনতে হয়নি। আমার বইগুলো নিয়েই পড়াশোনা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর থেকে সাঈদের স্বপ্ন ছিল বিসিএস ক্যাডার হবে। সেই লক্ষ্য নিয়েই পড়াশোনা করেছে। ক্লাস, নিজের পড়াশোনা, আর টিউশনি ছাড়া অন্য কোনো জীবন আমাদের ছিল না। অনেক রাত পর্যন্তও মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র পড়াতাম।

ভাই থাকেন, আমি যাচ্ছি (১৬ জুলাই ২০২৪) কোটাসংস্কার আন্দোলন শুরু হলে তাতে জড়িয়ে পড়ে সাঈদ। কয়েক দিন পরে জানতে পারি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সে-ই অন্যতম সমন্বয়ক। যে রাতে দেশের সব ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে ওঠে, সেই রাতে ওদের সঙ্গে আমিও মিছিলে ছিলাম। রাত ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত মিছিল করলাম। তখন ইউরো কাপের ফাইনাল চলছিল, সেই ম্যাচও দেখলাম। পরদিন আমাদের মেসে 'ফিস্ট' (ভোজ) ছিল। সপ্তাহের এই একটা দিন আমরা ভালোমন্দ খাই। কাকতালীয়ভাবে এবার বাজারের দায়িত্বে ছিল সাঈদ। কিন্তু সে এসে আমাকে বলল, ভাই, আপনি একটু ম্যানেজ করে নেন। আমি আরও তিনজনকে নিয়ে গিয়ে বাজার করে আনলাম। সাঈদ ওর এক বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানাল, সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করলাম। ১৬ জুলাই দুপুর ১২টার দিকে মেস থেকে বের হয় সাঈদ। যাওয়ার সময় বলল, 'ভাই থাকেন, আমি যাচ্ছি।' আর জানালো, বেলা তিনটায় ওদের মিছিল, চাইলে আমিও শরিক হতে পারি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যলয়ের কর্মসূচির আগেই শহর থেকে মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে আবু সাঈদ যোগদান করে। এই মিছিল অনুমানিক ১টা ৪০ মিনিটে পার্কের মোড়ে (শহিদ আবু সাঈদ চত্বর) প্রবেশ করে। তারপর আমিও কাজে বেরিয়ে পড়ি এবং পার্কের মোড়ে (শহিদ আবু সাঈদ চত্বর) মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় শেষে আমিও মিছিলে অংশগ্রহণ করি। হঠাৎ দেখি আমার ভাইটা গুলিবিদ্ধ হয়েছে। ছুটে যাই হাসপাতালে। মর্গে ঢুকে দেখি, আমার ভাইয়ের নিথর দেহ পড়ে আছে। ভিতরে ঢুকেই পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তা সাঈদের গায়ের টি-শার্ট কেটে খুলে ফেলতে বললে নি, আমি নিজ হাতে টি-শার্ট কেটে খুলে ফেললাম। ছেলেটার গায়ের দিকে তাকাতে পারছিলাম না, নিজেকে সামলে নিয়ে মর্গ থেকে বের হয়ে আসি। পরের সময়টুকু দুঃস্বপ্নের মতো। আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে গভীর রাতে সাঈদকে নিয়ে আমরা বাবনপুরের পথ ধরি। বিশাল গাড়িবহরের সঙ্গে যেতে যেতে মনে হলো, ছেলেটার কীভাবে বাড়ি ফেরার কথা ছিল! আর কীভাবে ফিরছে? কথাটা ভাবতেই শরীরটা শিউরে উঠল, বুকের ভেতরটা দুমড়েমুচড়ে গেল।

আবু সাঈদের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর

মোঃ আজহার আলী*

আবু সাঈদ, ওর বোন সুমি, মমতা- এরা সবাই আমার ছাত্র-ছাত্রী। অত্যন্ত সহজ ছেলে ছিল আবু সাঈদ। ছোট্ট মানুষ, কিন্তু এতো অভাবের ভেতর তার দিন যাচ্ছে, কাউকে সে বুঝতে দিত না। একটা শার্ট গায়ে দিয়েই বছরের পর বছর পার করত। আমাদের বাড়ি যেহেতু পাশাপাশি। স্কুলে যাবার সময় আমি তাকে সাইকেলের পেছনে বসিয়ে নিয়ে যেতাম। পরীক্ষা সময়ে সাইকেলে করে নিয়ে গেছি।

ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পাওয়াটা ওর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দিক। সাঈদ কষ্ট করে এই ফল পেয়েছিল। সে যখন ক্লাস ফোরের ছাত্র, সেবার এক নতুন ছাত্র আসে আমাদের স্কুলে। শিশির ফয়সাল তার ডাক নাম। সেও ভাল ছাত্র ছিল। এরপর থেকে প্রতিযোগিতা বাড়তে থাকে । সাঈদ ভেবেছিল, তার সাথে পারবে না বোধ হয়। তাই সে আরও সিরিয়াসভাবে পড়ালেখা করে যায়।

ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষার আগে সেই ছেলে সুন্দর ড্রেস পরে পরীক্ষা দিতে যায়, আবু সাইদের পরনে পুরনো জামা। আমার এখনও মনে আছে সেই দৃশ্য। যদিও সেই পরীক্ষায় আবু সাঈদ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিল।

ছোটবেলা থেকে আমি তাকে ইংরেজি পড়াতাম। তার বাবা বৃত্তি পাওয়ার খবর যখন জানে, তখন সে আমার কাছে এসে হাউমাউ করে কেঁদে ছিল। ওর বাবা এমনই, ভালো সংবাদেও কাঁদেন। খুব সাদাসিদা মানুষ।

সাঈদ পড়ালেখার প্রতি এতো মনোযোগী ছিল যে, কখনও স্কুল কামাই করত না। ক্লাসের সামনের বেঞ্চে বসার জন্য সে এতটাই সিরিয়াস ছিল যে, খুব সকালে আমি স্কুলে যাবার আগেই আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে যেত। স্কুলের তালা খুলে সে সামনের বেঞ্চে বই-খাতা রাখত। এভাবে প্রথম বেঞ্চে বসার জন্য সে না খেয়ে স্কুলে যেতো।

প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল আবু সাঈদের। মনোযোগ দিয়ে সবকিছু শুনত। স্কুলে প্রায় না খেয়ে যেতো, কোনদিন স্কুল মিস করেছে এমনটা আমার মনে নাই। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার পর আমার শ্যালকের ছেলেকে সে প্রাইভেট পড়াত। এটা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কন্টিনিউ করেছিল। যখন সে যেতো, আমার স্ত্রী তার হাতে ২০০-৪০০ টাকা দিত। শ্যালকের কাছে যা পাঠাতাম, ওখান থেকে কিছু তাকে দেয়া হতো।

ও যখন ক্লাস ফোরের ছাত্র ছিল, তখন আমি প্রতিদিন তার সাথে কথা বলতাম। আমি ছিলাম মসজিদের ইমাম । তার মধ্যে যে ইসলামী আকিদা দেখা যায়, সেটার ভিত্তি আমার সেই সব ক্লাস। আবু সাঈদ মসজিদে এসে নিয়মিত নামাজ পড়তো। বাড়িতে থাকতে তাকে জামাতের বাইরে নামাজ পড়তে দেখিনি।

মোঃ আজহার আলী, প্রধান শিক্ষক, জাফরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পীরগঞ্জ, রংপুর। শহীদ আবু সাঈদের শিক্ষক।

---

* শহীদ আবু সাঈদের স্কুল শিক্ষক

দ্রোহের ডানামেলা পাখি শহিদ আবু সাঈদ

শামসুর রহমান সুমন*

রৌদ্রদীপ্ত বিকেল বেলা কোটাসংস্কার আন্দোলনে দাবিতে ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মিডিয়া চত্বরে কিছু শিক্ষার্থী, হঠাৎ সামনে থেকে মাথায় ক্যাপ, চোখে চশমা, চেক শার্ট পরিহিত এক যুবক আসছেন মিছিলের দিকে। চোখে তার নিদারুণ স্বপ্ন- একদিন অনেক বড় হয়ে গড়বেন এ দেশ, দায়িত্ব গ্রহণ করবেন পরিবারের। সামনে গিয়ে হাত বাড়িয়ে পরিচয় হলাম সেই যুবকের সাথে। বয়সে বড় সম্বোধন করলাম ভাই বলে, তখন তিনি বলছিলেন এই অন্যায্যতা, এই বৈষম্য মেনে নেবার মতো নয়, বললেন আমিও যুক্ত হতে চাই, এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে। ঠিক সেদিন থেকে মিছিলের সম্মুখভাগ এসে তিনি মাইক নিয়ে এক তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন, বলতেন ন্যায্যতার কথা। বলতেন অধিকারের কথা, তারপর একরাশ ক্লান্তি নিয়ে আন্দোলনরত সকল সংগঠকদের নিয়ে আবু সাঈদ চত্বরে বসে ভাবতাম আমরা কি পারব আন্দোলন করে এই বৈষম্য দূর করতে? আবু সাঈদ ভাই দীপ্ত কণ্ঠ নিয়ে বলতেন আমরা পারব ভয় নাই। তারপর হঠাৎ একদিন চা খেতে খেতে তাঁর সাথে কথা হচ্ছিল, তিনি ইতঃপূর্বে এরকম কোনো কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেননি। কিন্তু এই কোটা বৈষম্য তিনি মেনে নিতে পারেননি। তখন তাঁর মুখেই জেনেছি তাঁর কোনো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে তিন জুলাই যেদিন মিছিলের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে জড়ো হচ্ছিলাম, টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। আবু সাঈদ ভাই আসলেন, প্ল্যাকার্ড নিলেন, রংতুলিতে লিখলেন সংবিধানের মূল কথা সুযোগের সমতা। তারপর দীপ্ত কণ্ঠে সকলকে সাথে নিয়ে একেবারে মিছিলের অগ্রভাগে গিয়ে শুরু করলেন, সেদিনের কর্মসূচি নিজেই স্লোগান ধরলেন, মিছিল দিতে দিতে ক্যাম্পাসের তৎকালীন নির্মাণাধীন গেটে এসে তার তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা আমাদের বিবেককে জাগ্রত করেছিল। আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি নিয়ে যখন আমরা মিটিং করতাম। তখন বিকেল বেলা হঠাৎ আবু সাঈদ ভাই আমাদের সেই মিটিং থেকে চলে যেতেন, একদিন তাকে প্রশ্ন করলাম ভাই প্রতিদিন বিকেল বেলা কোথায় যান। তিনি উত্তরে বললেন- "টিউশনি করাতে, এই টিউশনি আমাকে ভাত দেয়" কথাটা মনে বড় দাগ কেটেছিল। তারপর থেকে তিঁনি সন্ধ্যা বেলা টিউশন শেষ করে এসে পার্কের মোড় মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়ে আমায় ফোন দিতেন, নিচে গিয়ে চা খেতে খেতে কথা হতো, আগামীকাল কী কর্মসূচি হবে? খুব কাছ থেকে দেখেছি তাঁর অদম্যতা। বিরুদ্ধচারীদের মুখের সামনে স্পষ্ট প্রতিবাদ। সর্বদাই শুধু একটা কথা বলতেন ভয় পেয়ে কী হবে? তাঁর সেই সাহস আমাদের আন্দোলনে জুগিয়েছিল অদম্যতা। ৬ জুলাই সেদিন 'বাংলা ব্লকেডের' কর্মসূচিতে শহিদ আবু সাঈদ ভাইকে দেখেছি, কতটা দায়িত্ববানের মতো তিনি সেদিনের মিছিলকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সামনের দিকে। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে দিতে আমাদের মিছিল পৌঁছে গিয়েছিল মর্ডান মোড়ে, সেখানে দেখেছি তিনি দায়িত্বশীলতার সহিত রোগীবাহিত অ্যাম্বুলেন্সগুলো পারাপারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐদিন 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচির শেষে ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে পার্কের মোড়ে টঙ্গে বসে সেদিনের সারাদিনের আন্দোলন নিয়ে কথা হচ্ছিল। সেদিন তিনি আমার হাতে তাঁর টিউশনে পাওয়া দুইশত টাকা পরের দিনের ব্যানার বানাতে দিয়েছিলেন। ১১ জুলাই সকালবেলা লালটি-শার্ট চশমা পরে আবু সাঈদ ভাইসহ আমরা একত্রিত হয়ে আছি। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ আমাদের কোনোভাবেই সেদিন কর্মসূচি পালন করতে দিবে না। কিন্তু বজ্রকণ্ঠে আবু সাঈদ ভাইয়ের প্রতিবাদ সেদিন দেখেছি। তিনি প্রত্যাখ্যান করে এসে ওই দিনের আন্দোলনের ঘোষণা

---

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

দিয়েছিলেন। সেদিন মিছিলে তাঁর ওপর করা হয় নির্যাতন, চড় থাপ্পড় মারা হয়, গলাধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দেওয়া হয়, মিছিলের সেদিন যখন তারা শহিদ আবু সাঈদকে গলাধাক্কা দিতে দিতে নানানভাবে আমাদেরকে অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, আমাদের উপর হামলা করেছিল, নানান ধরনের বাজে স্লোগান গালিগালাজ ইত্যাদি করা হচ্ছিল, আমাদেরকে নানান ট্যাগ দেওয়া হচ্ছিল, তখন শহিদ আবু সাঈদ দীপ্ত কণ্ঠে ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন সুমন আমরা কি রাজাকার? আমরা কি শিবির? আমরা কি ছাত্রদল? এই কথা বলে তিনি বজ্র স্লোগান তুলেছিলেন ‘কোটা না মেধা? মেধা, মেধা,’। বলছিলেন ‘আমাদের সংগ্রাম চলছেই চলবে’ আপস না সংগ্রাম, দালালি না রাজপথ’। তাঁর এই বজ্র কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল অন্যায়ের প্রতিবাদ। সারাদিনের মিছিলের ক্লান্তি ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে জীবিকার তাগিদে পরদিন অংশ নিলেন বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায়। পরীক্ষা শেষে বিকেল বেলা জুমার নামাজ পড়ে আবারো হলো মিছিল, প্রতিবাদ জানালেন সারাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলার। সেদিন পাঞ্জাবি পরে স্বাধীনতা স্মারকে দাঁড়িয়ে সকল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বললেন “কারা আছো? যারা এই আন্দোলনে সামনে থেকে দেওয়াল হয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আন্দোলনের সামনের সারিতে, তখনো বুঝে উঠতে পারিনি কথাটা কতটা দীপ্ততা, সততা নিয়ে তিনি বলেছিলেন সেই কথা! যার নির্মম সত্যতার পরিচয় দিয়ে গেলেন ১৬ জুলাই। যখন শিক্ষার্থীদের বেধড়ক মারপিট করে গুলি করে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি দুপাশ থেকে দুহাতে সকলকে আহ্বান করেন মিছিলে। কিন্তু হায়নাদের চোখে পড়ে তাঁর সেই দৃশ্য, বেধড়ক মারপিট করতে থাকে তাঁকে। মাথার ওপরে দুহাত দিয়ে কিছুটা প্রতিরোধ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। যখন তিনি ক্যাম্পাসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দুহাত প্রসারিত করে আহ্বান করলেন সকল শিক্ষার্থীদের, ঠিক সেই সময়ে হায়নারা সেই সাহসী ডানা মেলা পাখিটিকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করলেন। হয়তো তিনি কল্পনা করেননি তাঁর ক্যাম্পাসের সামনেই এভাবে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হবে। শহিদ আবু সাঈদের মৃত্যুর পর তাঁর একাডেমিক সাফল্যগুলো আমাদের সত্যিই বিমোহিত করেছে। ডিপার্টমেন্টের স্নাতক সম্মান পরীক্ষার ফলাফল বেরোলো। সেখানে ১৪তম স্থান অধিকার করে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে কৃতকার্য হলেন। আন্দোলনের সেই ক্লান্তি নির্মম নির্যাতন নিপীড়নের মধ্যেও পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেন এনটিআরসি এর সেই পরীক্ষায়। তাই তো আজও বলি আমরা শুধুমাত্র একজন তরুণ বিপ্লবী সহযোদ্ধাকে হারায়নি, হারিয়েছি দেশের এক মেধাবী শিক্ষার্থীকে।

তাঁর এই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বিশ্ব দেখল এক নতুন নির্মমতা। শহিদ আবু সাঈদ একটি ইতিহাসের নাম, যখনি আবারো এদেশে কালো মেঘের ঘনঘটা তৈরি হবে। ন্যায্যতার প্রশ্নে জনগণ মাঠে নেমে আসবে। সেদিন শহিদ আবু সাঈদ হবে আমাদের প্রেরণা। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম জানতে ও বুঝতে শিখবে কীভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কীভাবে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে, কীভাবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে দু'হাত প্রসারিত করে শাসকের বন্দুকের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। প্রজন্ম শিখবে অন্যায়ের প্রতিবাদের ভাষা।

হাসনাত আবদুল্লাহর জুলাই স্মৃতি
আবু সাঈদ শহিদ হলে সিদ্ধান্ত নিই, রক্ত মাড়িয়ে সংলাপ নয়

হাসনাত আবদুল্লাহ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে গড়ে ওঠা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-এর অন্যতম সমন্বয়ক হিসেবে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী সরকারের পতনের দাবিতে রাজপথ কাঁপিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এই সময় রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের শিকার হয়ে তাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। পুলিশের হাতে বন্দী থেকে ট্রমার মধ্য দিয়েও দিনযাপন করতে হয়।

৯ জুলাই বাংলা ব্লকেড নামে একটা কর্মসূচি দুই দিন চলে। এরপর একদিন বিরতি নিয়ে আমাদের সমন্বয়ক টিমকে ভাগ করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠাই, আমি ‘কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে গিয়ে ছাত্রদের সাথে কথা বলি। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন যেখানে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়েছে সেই স্থানগুলো দেখে ছাত্রদের নির্দেশনা দেই। সমন্বয়করা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। সমন্বয়কদের নেতৃত্বে সারা দেশে শিক্ষার্থীরা সুসংগঠিত হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও সমন্বয়ক নির্বাচিত করার পর বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

১৪ জুলাই রাষ্ট্রপতির কাছে আমরা স্মারকলিপি দিয়ে হলে ফিরি, ওইদিন গণভবনে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার একটা প্রেস কনফারেন্স ছিল। সেই প্রেস কনফারেন্সে শেখ হাসিনা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের রাজাকারের নাতি-পুতি বলে আপত্তিকর বক্তব্যের পর ওই রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ জানাতে স্লোগান নিয়ে রাজপথে নেমে আসেন।

সেদিন রাতে একটা আইকনিক মিছিল ঢাকাসহ সারা দেশ প্রকম্পিত করেছিল একটি স্লোগান দিয়ে তুমি কে? আমি কে? রাজাকার! রাজাকার!! কে বলেছে কে বলেছে স্বৈরাচার স্বৈরাচার। সে রাতে রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল, ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, কুয়েত মৈত্রী হল থেকেও ছাত্রীরা রাস্তায় নেমে আসে।

১৫ জুলাই দুপুর ১২টায় আমরা রাজু ভাস্কর্যে একটি কর্মসূচি দেই। ছাত্রলীগ পাল্টা কর্মসূচি দেয়। রাজু ভাস্কর্য থেকে আমরা যখন হলের দিকে প্রতিদিনকার মতো মিছিল নিয়ে আসতে থাকি, তখনই বিজয় একাত্তর হলে ছাত্রলীগ নৃশংসভাবে আমাদের শিক্ষার্থীদের ওপর অতর্কিতভাবে হামলা চালায়। ওবায়দুল কাদের বলেন, এই আন্দোলন দমন করার জন্য ছাত্রলীগই যথেষ্ট। তারা নারী শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পিটিয়ে আহত করে। রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের সামনে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের শাকিরুল ইসলাম শাকিল আমাকে বাজেভাবে পিটিয়ে আহত করে। আমার বাঁ পায়ে জখম হয়।

৯ জুলাই ‘বাংলা ব্লকেড’ কর্মসূচির আগে সর্বপ্রথম আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একজন শাহবাগ থেকে আমাদের ডেকে নিয়ে যায়। আমাদের সাথে নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলম, আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ছিলো। তখন টিএসসিতে ওই কর্মকর্তা জিজ্ঞেস করেন, আমাদের মোটিভ কী? আমরা বারবার বলেছি, রাষ্ট্রের মধ্যে যে বৈষম্য আছে তা নিরসনের জন্য আমরা আন্দোলন করছি। শাহবাগ থানার পুলিশসহ অন্যান্য জোনের পুলিশও ছিল সেখানে। পুলিশ পেসার দিতে থাকে আমরা যেন আন্দোলন তুলে নেই। হাসনাত বলেন, ছাত্রলীগ মনে করেছিল ১৫ জুলাইয়ে হামলা করেই আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়া যাবে। কিন্তু ১৬ জুলাই আরও বেশি শিক্ষার্থী শহীদ মিনারে জড়ো হয়। একই দিন দুপুরে আমরা একটি অনলাইন মিটিং করছিলাম। মিটিংয়ে আমি, নাহিদ

ইসলাম, সারজিস আলম, আসিফ মাহমুদ, বাকের, হাসিব থেকে শুরু করে অন্যরাও উপস্থিত ছিল। এ সময় খবর পাই যে রংপুরে আবু সাঈদকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে। তখন আমরা ওই মিটিংয়েই সিদ্ধান্ত নেই আর কোনো সংলাপ হবে না। রক্ত মাড়িয়ে কোনো সংলাপ নয়।

১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি চত্বরে গায়েবানা নামাজে জানাজা চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা আমাদের কনস্ট্যান্টলি ফোর্স করতে থাকে যেন গায়েবানা নামাজে জানাজা না করি। গায়েবানা নামাজে জানাজা শেষ করে আমরা যখন কফিন কাঁধে মিছিল নিয়ে ভিসির বাসভবনের সামনে দিয়ে রাজু ভাস্কর্যের দিকে যেতে চাই, তখনই আমাদের দুই দিক থেকে মুহুর্মুহু টিয়ার শেল এবং সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়তে থাকে।

সেদিন বিকেল ৫টার মধ্যে হলগুলো খালি করার নির্দেশ দিয়ে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। ভিসি আন্দোলন প্রত্যাহারের চাপ দেন। হল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরা সবাই বিক্ষিপ্ত হয়ে যাই। তখন আন্দোলন সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের তৎকালীন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী (নওফেল) সংলাপের প্রস্তাব দেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজন আমাদের বলে, মিটিং করার জন্য একটা জায়গায় আমাদের যেতে হবে। মিটিং করা সম্ভব না বললে তারা আমাদের জোরপূর্বক রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মাতে নিয়ে যায়। সেখানে তিন মন্ত্রী প্রবেশ করেন। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাতের সাথে মিটিং করতে না চাইলে ৪০ মিনিট পর তারা চলে যান। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ক্ষুব্ধ হয়ে আমাদের একটি সেইফ হোমে নিয়ে রাখে।

পরদিন আমাদেরকে জুমার নামাজ পড়তে দেয়া হয়নি। তিন মন্ত্রীর সাথে দেখা না করায় আমাদেরকে আগের দিন সারারাত পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আমাকে একবার, সারজিসকে একবার, এভাবে পালাক্রমে জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকে। তারা আমাকে বলে, সারজিস রাজি হয়ে গেছে। সারজিসকে বলে, আমি রাজি হয়ে গিয়েছি। নানাভাবে পারিবারিক বিষয়গুলো টেনে এনে ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা করা হতে থাকে। তিনি বলেন, একপর্যায়ে আমাকে কিচেন রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। জুমার নামাজের পরে আরেকটা টিম আমাদের কাছে আসে এবং তারা আরো বেশি অ্যাগ্রেসিভ হয়। প্রথম লাঞ্ছনার শিকার হই। আমাকে কিচেনে একপর্যায়ে থাপ্পড় দেয়া হয়। আমাকে বলে যে, আমার পরিবার তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। নাহিদসহ আরো যারা আন্দোলনকারী আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা যেন মিটিং করি।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে প্রেস কনফারেন্সের দিনও প্রেশার দেয়া হয় এটা বলার জন্য যে, আমরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন আমাদেরকে প্রেশার দেয়, আমরা যেন মিটিং করি। তার পর থেকে আমি আমার স্মার্টফোন ব্যবহার বন্ধ করে দেই। একটা বাটন ফোন ব্যবহার করা শুরু করি। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির প্রেস কনফারেন্সের পরে আমি মামার বাসায় না গিয়ে কাঁটাবনে আমার বন্ধুর সাথে থাকি। ওই দিন রাতেই আমি আবার মামার বাসায় চলে আসি। সারজিসকেও সেখানে আসতে বলি। নাহিদ ইসলামকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে নিরাপত্তা বাহিনী সদস্যরা এসে সাইন্সল্যাবের বাসা থেকে আমাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর তারা আমাদেরকে গাড়িতে সারা ঢাকা ঘোরায়। তার পর আমাদেরকে তাদের অফিসে নিয়ে যায়।

হাসনাত বলেন, নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসের প্যাটার্ন ছিল এই টাইপের একটা জায়গায় ৩০ জনের মতো অফিস করে। বাথরুম হচ্ছে একটা। সারাদিন আমাদেরকে বাথরুমের সামনে বসিয়ে রাখত।

বসার জায়গা নেই, শোয়ার জায়গা নেই, কমপি-টলি ওই অফিসে পেপার-পত্রিকা সব বন্ধ, মোবাইল বন্ধ, টিভি বন্ধ। সে সময় নিরাপত্তা বাহিনীর এক সদস্য আমার সাথে খুবই রূঢ় আচরণ করে। সে আমাকে খাবারে সমস্যা করেছে এবং সারারাত বাথরুমের সামনে বসিয়ে রাখত। নিরাপত্তা হেফাজত থেকে এক দিন আমাদের গার্ডিয়ানদের আসতে বলা হয়। আমার এক ভগ্নিপতি আসেন আমাকে নেয়ার জন্য। ওনাকে রাত ১১টা পর্যন্ত বসিয়ে রেখে বলেন, 'আপনি চলে যান। কোনো ডিসিশন হয়নি।'

বাসস'র সৌজন্যে

জুলাই আন্দোলনে আমার স্মৃতি

শাহরিয়ার সোহাগ*

সূত্রপাত

২০২৪ এর ৫ জুনে এসে ২০১৮ সালে বাতিল হওয়া কোটা পদ্ধতি আবারও সম্পূর্ণভাবে পুনর্বহাল করা হলে সারাদেশের মতো বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও এই আন্দোলনে সক্রিয় হয়। কোটাবিরোধী আন্দোলনের সেটাই শুরু।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আন্দোলন হয় ৩০ জুন। বাংলা বিভাগের শামসুর রহমান সুমন, ইংরেজি বিভাগের মো. শফিকুল ইসলাম, ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ফয়সাল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের গোলাম শাওন, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের কামরুল হাসান কাব্য সহ আরও কয়েকজন শুরুতে উদ্যোগী হয়ে আন্দোলনের ডাক দেয়।

এ সময় বাংলা বিভাগের আয়োজনে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার চলছিল। সেমিনারে অংশ নেওয়ায় প্রথম দিনের আন্দোলনে যুক্ত হতে পারলেও তাদের ব্যানার আমার চোখে পড়ে। লক্ষ্য করি, তারা ব্যানারে লিখেছে '২০১৮ এর পরিপত্র পূনর্বহাল করতে হবে'। এটি দেখে কামরুল হাসান কাব্যের সাথে যোগাযোগ করে তাকে জানাই, "কোটার মাত্রা ৫৬ শতাংশ হওয়া যেমন অন্যায্য তেমনি কোটা শূন্য শতাংশ হওয়াও অসাংবিধানিক। আমাদের উচিৎ হবে কোটা পদ্ধতির সংস্কার করে এটিকে সহনীয় ও যৌক্তিক পর্যায়ে আনার দাবি তোলা।"

এই আলোচনার পর পরবর্তী আন্দোলনগুলো আর '২০১৮'র পরিপত্র পুনর্বহাল' দাবি না করে বরং কোটা সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার হয়।

পহেলা জুলাইয়ের আন্দোলনে আবু সাঈদ ভাইসহ আমরা অনেকে যুক্ত হলে এটি আরও বেগবান হয়। আন্দোলনে যুক্ত হয়ে সেদিন গণমাধ্যমকে আমি জানাই, 'যখন আমাদের ব্যস্ত থাকার কথা শিক্ষা-গবেষণা-খেলাধুলায়, তখন আমরা ন্যায্য অধিকারের জন্য রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছি। অযৌক্তিক এই কোটা পদ্ধতি আমাদেরকে 'ভাত দে টাইপে'র আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

প্রথম প্রতিরোধ

জুলাইয়ের শুরু থেকে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন যখন তীব্র আকার ধারণ করছে, দিন দিন মিছিল বড় হচ্ছে, তখন আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে ছাত্রলীগের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করি। তারা মূলত আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণ করে দিচ্ছিল। তবে ৭ জুলাইয়ের একটি ঘটনা সব ঘুরিয়ে দেয়।

সেদিন সারা দেশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমরা ঢাকা-কুড়িগ্রাম মহাসড়কের মডার্ন মোড়ে 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি পালন করছিলাম। কর্মসূচি চলাকালে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি পোমেল বড়ুয়া হঠাৎ ওই স্থানে আসেন এবং তৎক্ষণাৎ কর্মসূচি তুলে নিতে বলেন। তখন গতানুগতিকভাবে ছাত্রলীগের অন্যায় নির্দেশ মেনে অনেকে কর্মসূচি শেষ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি দৃঢ় কণ্ঠে তার প্রতিবাদ জানাই। এই প্রতিরোধের ফলে অন্য শিক্ষার্থীরাও ধীরে ধীরে কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ছাত্রলীগ সভাপতি স্থান ত্যাগ করেন।

---

* শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১৩তম ব্যাচ, বেরোবি, রংপুর।

৭ জুলাইয়ের এই প্রতিরোধ সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভয় ভেঙে দেয়। ১০ জুলাই আসতে আসতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে আন্দোলনের অন্যতম দুর্গ।

১০ জুলাই অভিযোগ আনা হয়, ছাত্রলীগ সভাপতির সঙ্গে বিরোধ বাঁধিয়ে আমি সবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গেছি। 'বিভেদ সৃষ্টিকারী' আখ্যা দিয়ে নেতৃত্বের একটি অংশ আমাকে আন্দোলন পরিচালনার কেন্দ্রীয় গ্রুপ থেকে বহিষ্কার করেন। এতে আমি সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।

১১ জুলাই পূর্বঘোষিত কর্মসূচিতে ছাত্রলীগ অকস্মাৎ দলবদ্ধভাবে হামলা করে। ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে বুক আগলে দাঁড়ান আবু সাঈদ ভাই। অন্যান্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে সেদিন তিনি আক্রমণ ও লাঞ্ছনার শিকার হন। আকস্মিক এ হামলা আন্দোলনকারীদের মনোবল ভেঙে দেয়। আমি ফেসবুক পোস্ট দিই, 'বেরোবির (বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়) আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের বিভিন্ন সময়ের আপসকামী ও নতজানু ভূমিকা নিয়ে আমাদের সমালোচনা রয়েছে। তাদের এই আপসকামী ও নতজানু মনোভাবের জবাব বেরোবির সাধারণ শিক্ষার্থীদের দিতে হবে।'

এরপর আবু সাঈদ ভাই আবার আমাকে আন্দোলন পরিচালনার কেন্দ্রীয় গ্রুপে যুক্ত করেন এবং গ্রুপের অ্যাডমিনও করেন। পরে তিনিই আমাকে সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 'সমন্বয় সারাদেশ গ্রুপে যুক্ত করেন। আন্দোলনে সবাইকে যুক্ত করবার ক্ষেত্রে আবু সাঈদ ভাই খুবই যত্নবান ছিলেন।

১২ জুলাই আন্দোলনে ফেরার পর আমার মনে হয়, সমন্বয়ক প্যানেলকে প্রকৃত আন্দোলনকারীদের দিয়ে ঢেলে সাজাতে না পারলে আন্দোলনে গতি আসবে না। এ বিষয়ে আবু সাঈদ ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করি। তারপর একটি সভায় সবার সিদ্ধান্তে বিভিন্ন বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীদেরকে যুক্ত করা হয়। দুজন নারী শিক্ষার্থী, ইংরেজি বিভাগের সাবিনা ইয়াসমিন ও ব্যবস্থাপনা অধ্যয়ন বিভাগের সাবিনা আক্তারকে সমন্বয়ক হিসেবে যুক্ত করে প্যানেলটি ঢেলে সাজানো হয়।

১১ জুলাই রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা ও গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ১২ জুলাই শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্যাম্পাসে আমরা বিক্ষোভ মিছিল করি। মূলত: এদিনই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা আন্দোলন ছাত্রলীগের 'ছায়া আন্দোলন' থেকে বেরিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীরা সাহসী হয়ে ওঠেন। অতপর ১৩ ও ১৪ জুলাই আমাদের কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়।

১৩ জুলাই জানতে পারি, তাজহাট থানায় কয়েকজন আন্দোলনকারীর নাম লাল তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তাতে আবু সাঈদ ভাই, আমিসহ আরও কয়েকজনের নাম আছে।

আন্দোলনের বাঁকবদল

১৪ জুলাই শেখ হাসিনা 'রাজাকারের নাতিপুতি' বলে আখ্যায়িত করলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ঐদিন রাতে এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ডাক দেওয়া বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের মেয়েরা তালা ভেঙে বের হয়ে আসেন। গভীর রাতে ক্যাম্পাস পরিণত হয় জনসমুদ্রে। বিজয় ২৪ হল (তৎকালীন বঙ্গবন্ধু হল) ও শহিদ মুখতার ইলাহী হলের ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা দেশি অস্ত্র নিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। 'কোটা সংস্কার আন্দোলন'এই দিনে 'রাষ্ট্রসংস্কার আন্দোলনে রূপ নেয়।

তবে ছাত্রলীগের সশস্ত্র হামলার কারণে পরিস্থিতির নেতৃত্ব স্থানীয় অনেকে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান। এমন নেতৃত্ব শূন্যতার সময়ে, নেতৃত্বে এসে যুক্ত হন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আশিকুর রহমান আশিক ও আকিব ভাই।

১৫ জুলাই আমাদের কর্মসূচি কেমন হবে সে বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা কয়েকজন আবু সাঈদ ভাইয়ের ছাত্রাবাসে যাই। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের জাব্বার, সাংবাদিকতা বিভাগের দীপ্ত তালুকদার, ইতিহাস বিভাগের শাওনসহ আমরা কয়েকজন মিলে সিদ্ধান্ত নিই যে, ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচি জারি রাখতে হবে। কেন্দ্রের প্রত্যেকটি কর্মসূচিতে আমাদেরও জোরালো অবস্থান থাকতে হবে। আবু সাঈদ ভাইয়ের সম্মতিতে আমরা ১৫ জুলাই কর্মসূচি গ্রহণ করি।

কর্মসূচি ঘোষণার পর ঐদিন নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখি, আমাদের জমায়েতের স্থান ছাত্রলীগ আগেই দখলে নিয়েছে। তাদের হাতে লাঠিসোটাসহ দেশি অস্ত্র। তাদের কারণে আমরা কর্মসূচি পালন না করে তাৎক্ষণিক জরুরি সভা ডাকি। অবস্থা সেদিন এতটা ভয়াবহ ছিল যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে কোথাও একত্র হতে পারছিলাম না। তাই কারমাইকেল কলেজের কাছে গিয়ে সভা করি। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী রিনা মুর্মুর সভাপতিত্বে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের সমন্বয়কদের যুক্ত করা হয়। গোয়েন্দা পুলিশ আমাদের ওপর নজর রাখছিল।

সেই সভায় আন্দোলনের কৌশলে বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, ১৬ জুলাই কারমাইকেল কলেজের সামনে জমায়েত করা হবে। তবে ১৬ জুলাই আসতে আসতে পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়ায় শিক্ষার্থীদের কেউ সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া দিচ্ছিলেন না। দিলে গ্রেপ্তার বা জরিমানা করা হচ্ছিল।

অনেকটা উপায়হীন অবস্থায় পড়ে, আমি তখন গণসংহতি আন্দোলন রংপুরের নেতা তৌহিদুর রহমানের সঙ্গে কথা বলি। তিনি শুরু থেকেই আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে আসছিলেন। তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবার কথা বলেন।

ডেট লাইন ১৬ জুলাই

১৬ জুলাই সকালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টি মাথায় করে আমি, আশিক ভাই ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুনতাসীর বেরিয়ে পড়ি সবকিছু সংগ্রহ করতে। সাউন্ড সিস্টেম অবশ্য কেউ ভাড়া দিতে রাজি হলো না। শেষে টাউন হলের সামনে থেকে দুটি হ্যান্ডমাইক কিনে নিই। আত্মরক্ষার জন্য তৌহিদ ভাইয়ের নির্ধারিত দোকান থেকে ৫০টি এসএস পাইপ কিনে সেগুলোর সঙ্গে পতাকা বেঁধে নিই। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, ৫০ জন পতাকাধারী মিছিলের সামনে ও পেছনে অবস্থান নেবে, যাতে ছাত্রলীগ অস্ত্র নিয়ে হামলা চালালে আমরা অন্তত আত্মরক্ষা করতে পারি।

১৬ জুলাইয়ের কর্মসূচি ছিল বিকেল ৩টায়। কিন্তু আগের দিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, যেখানেই জমায়েতের স্থান দিই না কেন, ছাত্রলীগ আগেই তার দখল নেবে। তাই কর্মসূচি বেলা তিনটায় থাকলেও তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকজন মিলে আলোচনা করে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে আসি। আমরা সংঘাত এড়াতে চেয়েছিলাম, ছাত্রলীগ ও পুলিশ বাহিনীকে সুযোগ দিতে চাচ্ছিলাম না। সিদ্ধান্ত নিয়ে সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে আমরা ঘোষণা দিই যে, আজকের কর্মসূচি শুরু হবে বেলা ১১টায়।

সিদ্ধান্তটি খুবই কার্যকর ছিল। রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর কলেজ, পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ শহরের সব স্কুল ও

কলেজের শিক্ষার্থীরা পুলিশ ও ছাত্রলীগের বাধা উপেক্ষা করে কারমাইকেল কলেজের সামনে সংগঠিত হয়। এরপর জনসমুদ্র এগোতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে।

তারপর তো ইতিহাস! বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে আমরা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর থেকে পুলিশ আমাদের গুলি ছুড়ছে। আর চেনামুখ মানুষগুলো অচেনা সেদিন। আমাদের মারতে মরিয়া তারা। যদিও তারা কেউ আমাদের শিক্ষক, কেউ কর্মকর্তা বা কর্মচারী আর কেউ বা এখানকারই শিক্ষার্থী। বাকিরা অস্ত্রধারী দলীয় ক্যাডার। তারা হায়েনার মতো আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমরা পুলিশের সামনেই। সাঈদ ভাইয়ের ঠিক পেছনেই মাইক হাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। প্রাণপণ ডেকেও তাঁকে ফেরাতে পারিনি। আবু সাঈদ ভাই শহিদ হলেন। আমিসহ আরও শতাধিক শিক্ষার্থী-জনতা গুলিবিদ্ধ হই সেদিন।

ভাইয়ের শহিদ হবার ঘটনাটি এই আন্দোলনকে একেবারে পাল্টে দেয়। দুই বাহু মেলে দেওয়া আবু সাঈদ ভাইকে যে বুলেটগুলো বিদ্ধ করেছিল, সেগুলো যেন একেকটি পেরেক হয়ে বিঁধল ফ্যাসিস্টদের কফিনে। সারাদেশের মানুষ বানের জলের মতো রাস্তায় নেমে আসে। শুরুতে আমরা মাত্র কয়েকজন আন্দোলন শুরু করেছিলাম। এরপর 'আমরা অনেকজন' হয়ে যাই। অনেক মানুষের মিলিত শক্তি এক হয়ে ফ্যাসিবাদী মহাজনের দালান দখল করে ফেলি। আসে ২৪'র ঐতিহাসিক বিজয়, আমরা পাই ৫ আগস্ট, দ্বিতীয়বারের স্বাধীনতা।

স্মৃতির পাতায় শহিদ আবু সাঈদ

মাহিদ হাসান শাকিল*

আজ যে কলম হাতে নিয়েছি, তা যেন ভারাক্রান্ত হৃদয়ের নিঃসীম শোকের প্রতিধ্বনি। আমার শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যের দীর্ঘ পথচলার একজন অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী ছিলেন শহিদ আবু সাঈদ। একজন সাহসী, প্রতিবাদী এবং সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করা মানুষ, যাকে হারিয়েছি ইতিহাসের নির্মম এক বাঁকে। শহিদ আবু সাঈদ-শুধু একটি নাম নয়, বরং একটি প্রেরণা, একটি বীরত্বের প্রতীক এবং একটি অকুতোভয় হৃদয়ের পরিচয়। বাল্যকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রতিটি স্তরে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল আত্মার বন্ধনে গাঁথা। আজ সেই বন্ধুকে স্মরণ করতে গিয়ে কলম বারবার কেঁপে উঠছে এবং চোখের কোণে জমছে অশ্রু।

আমাদের পরিচয় সেই বাল্যকালেই। আমরা পাশাপাশি গ্রামে বড় হয়েছি। যদিও একই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িনি, তবুও আড্ডা, খেলাধুলা ও একসঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো আমাদের একে অপরকে জানার সুযোগ করে দিয়েছিল। ধীরে ধীরে সেই সম্পর্ক পরিণত হয়েছিল এক গভীর ও অটুট বন্ধনে। যদিও আমরা আলাদা স্কুলে পড়েছি তবুও বন্ধুত্বের বাঁধনে কখনো কোনো ফাটল ধরেনি। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছিল। পরবর্তীতে আমরা একসাথে ভর্তি হই রংপুর সরকারি কলেজে, আর সেখান থেকেই আমাদের সম্পর্কএক নতুন মাত্রা পেয়েছিল। এরপর আমরা একসাথে ভর্তি হই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে কেবল বন্ধুত্বই নয়, চিন্তা, স্বপ্ন ও সংগ্রামে আমরা একে অপরের হয়ে উঠেছিলাম একান্ত সহযাত্রী।

একজন সহজ-সরল যোদ্ধার কথা

প্রত্যেক মানুষের জীবনে কিছু সম্পর্ক থাকে, যেগুলো ভাষার বাঁধনে আবদ্ধ করা যায় না। আবু সাঈদ ছিল আমার ঠিক তেমনি একজন বন্ধু-সহপাঠী, সহযোদ্ধা, আর নিঃস্বার্থ আত্মার প্রতিচ্ছবি। তার সহজ-সরল জীবন, তার স্বচ্ছ চিন্তা, আর তার অবিচল মনোবল আজও আমার হৃদয়ে এক দীপ্ত মশাল হয়ে জ্বলছে।

শহিদ আবু সাঈদের জীবন ছিল খুবই সাধারণ, কিন্তু সেই সাধারণতার মাঝেই ছিল এক ব্যতিক্রমী দীপ্তি-এক অনাড়ম্বর সংগ্রামী যাত্রা, যা শুরু হয়েছিল এক নির্জন গ্রামের

---

*শিক্ষার্থী, একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

নিঃশব্দ প্রাঙ্গণ থেকে। পরিবারের আর্থিক টানাপোড়েনকে সে কখনো দুঃখের দেওয়াল বানায়নি; বরং পরিণত করেছিল আত্মশক্তিরচূড়ান্ত এক উৎসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় সাঈদ টিউশনি করে নিজের খরচ চালাত। দিনশেষে ক্লান্ত শরীর নিয়ে ফিরলেও তার চোখ-মুখে থাকত সাহসের দীপ্তি। বিকেলে ছাত্র পড়িয়ে রাত জেগে সে নিজের পড়ালেখা চালিয়ে যেত। তবে শুধু পাঠ্যবইয়ের গণ্ডিতেই তার জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল না, বৈশ্বিক রাজনীতি, ধর্মীয় দর্শন, মুক্তচিন্তা– সবই ছিল তার ভাবনার অংশ। সে গভীরভাবে চিন্তা করত কীভাবে একটি সমাজকে ন্যায়ের পথে এগিয়ে নেওয়া যায়।

সাঈদের মধ্যে ছিল এক অসাধারণ ধর্মচেতনা– কখনো জোরাজুরি নয়, কখনো লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নয়, বরং একান্ত আন্তরিক ও আত্মিক অনুভব। সে সময়মতো নামাজ আদায় করত ও রোজা রাখত নিয়ম করে। কেউ তাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখেনি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল, যতই অভাব থাকুক না কেন, সে কখনো আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে দিত না। টিউশনির টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় বই কিনত, নিজের চলাফেরার খরচ সামলে, এক কাপ চায়ের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা আলোচনা করতাম স্বপ্ন নিয়ে, সমাজ নিয়ে, দেশ নিয়ে।

এর পাশাপাশি সাঈদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বিসিএস ক্যাডার হয়ে রাষ্ট্রের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। সে সবসময় বলত, “সিস্টেম বদলাতে চাইলে সিস্টেমের ভেতর যেতে হবে।” এই কথা শুধু মুখে বলত না, বরং তার প্রতিটি আচরণে, প্রস্তুতিতে, আত্মনিয়োগে সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছিল।

আন্দোলনের উত্তাল সেই দিনে সাঈদের দৃপ্ত ভূমিকা এবং তার চিরবিদায়

১৬ জুলাই ২০২৪, এই দিনটি হয়তো ক্যালেন্ডারের পাতায় কেবল আরেকটি তারিখ, কিন্তু আমার জীবনের পাতায় এটি চিরন্তন এক ক্ষত এবং এক অমোচনীয় দাগ। এটি শুধু একটি দিনই ছিল না, বরং ছিল এক সত্য, সাহস, স্বপ্ন ও আত্মত্যাগে গাঁথা এক মহাকাব্যের জন্মক্ষণ।আর সেই মহাকাব্যের নায়ক ছিলেন আমার বন্ধু, শহিদ আবু সাঈদ।

২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের জুনে যখন কোটাসংস্কার আন্দোলনের ঢেউ তরুণদের হৃদয়ে গর্জে ওঠে, তখন আবু সাঈদ কেবল একজন অংশগ্রহণকারী ছিলেন না. বরং তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক নির্ভীক কণ্ঠস্বর, এক সংগঠক ও এক আদর্শ। তিনি ‘স্টুডেন্টস অ্যাগেইনস্ট ডিসক্রিমিনেশন’ নামক সংগঠনের সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং সংগঠনের চেতনায় যুক্ত করেছিলেন যুক্তি, শৃঙ্খলা ও মানবিকতার ভিত্তি। তার নেতৃত্বে আন্দোলন পেয়েছিল একটি সাংগঠনিক কাঠামো, যেখানে প্রতিটি

প্রতিবাদ ছিল সুপরিকল্পিত এবং প্রতিটি দাবি ছিল সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুক্তিবদ্ধ প্রতিরোধ। আন্দোলনের প্রতিটি সভায়এবং প্রতিটি মিছিলে সে ছিল সম্মুখ সারিতে। এক হাতে প্ল্যাকার্ড ও অন্য হাতে ন্যায়বোধের অদৃশ্য পতাকা। তার উপস্থিতিই যেন ছিল আন্দোলোনকারীদের সাহসের প্রতিচ্ছবি।

সে বলত,"এ লড়াই কেবল কোটাসংস্কারের জন্য নয়, এটি একটি অন্যায্য সমাজব্যবস্থাকে মানবিক করার লড়াই।"

তার বক্তৃতায় কখনো উত্তেজনার সুর ছিল না; বরং ছিল যুক্তি, সহানুভূতি ও হৃদয় ছোঁয়া সত্যের উচ্চারণ। সে বিশ্বাস করত– পরিবর্তন আসে হৃদয় জয়ের মাধ্যমে, ভয় দেখিয়ে নয়।

বেদনাবিধুর স্মৃতির দিন

১৬ জুলাই ২০২৪, সকালটা ছিল অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক। কেউ বুঝতে পারেনি– এই দিনটি হয়ে উঠবে ইতিহাসের পাতায় রক্তিম অক্ষরে লেখা এক বেদনাবিধুর অধ্যায়।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেটের সামনে (বর্তমানে শহিদ আবু সাঈদ গেট) আমরা ছিলাম শত শত শিক্ষার্থী কোটাসংস্কারের দাবিতে এক শান্তিপূর্ণ অবস্থানে। কারো হাতে ছিল ব্যানার এবং কারো মুখে ন্যায়ের দাবির স্লোগান আর সবার চোখেমুখে ছিল অটল প্রত্যয়– একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন।

আমরা চেয়েছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করতে এবং পরে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে। কিন্তু সেই ন্যায্য ও শেষ চেষ্টাটুকুও যেন ক্ষমতার চোখে অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের পথ রুদ্ধ করা হয় শুরু হয় উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়।

ধীরে ধীরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং যা ঘটেছিল তা ছিল নির্মম, অমানবিক এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

পুলিশ হঠাৎ করেই আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে শুরু করল লাঠিচার্জ। চারপাশে ছড়িয়ে গেল টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া। আর বাতাসে গর্জে উঠল রাবার বুলেটের কর্কশ শব্দ। চারদিকে আতঙ্ক, আর বিশৃঙ্খলায় অনেকেই দিশেহারা হয়ে পালাতে চেষ্টা করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে, আমরা তাকিয়ে দেখি-সবাই যখন পিছু হটছে, তখন আবু সাঈদ ঠিক উল্টোপথে হাঁটছে। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে পুলিশের দিকে, যেন ভয়কে মাটিতে পিষে সামনে এগিয়ে চলেছে এক নায়ক। তার দুহাত প্রসারিত, মাথা উঁচু ও বুক চিতিয়ে সে দাঁড়িয়ে গেল বন্দুক তাক করা পুলিশের সামনে। তার চোখে কোনো আতঙ্ক ছিল না, ছিল স্পষ্ট উচ্চারণহীন এক বার্তা:

"আমি কোনো হুমকি নই। আমি একজন ছাত্র, আমি ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো একজন মানুষ।" সে কোনো পাথর ছোড়েনি, কোনো উত্তেজনাকর স্লোগানও দেয়নি। সে কেবল দাঁড়িয়ে ছিল, নিঃশব্দ প্রতিবাদের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়ে।

কিন্তু এই শান্ত, দৃপ্ত অবস্থানটুকুও সহ্য হলো না রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে। একটি, দুটি... পরপর কয়েকটি গুলি বিদ্ধ করল তার বুক। যেন এক বুক স্বপ্নকে বিদীর্ণ করে দিল নিষ্ঠুরতার অস্ত্র।

সেই মুহূর্তেই থেমে গেল একটি জীবন। কিন্তু জন্ম নিল এক নতুন ইতিহাস, যেখানে এক নিরস্ত্র ছাত্র, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে ও নিজেকে উৎসর্গ করেছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সেই দিনক্ষণ, রক্তঝরা প্রাঙ্গণ-সব মিলিয়ে সৃষ্টি হলো এক অনন্ত প্রতীক, যা প্রমাণ করে দিল: বীরেরা অস্ত্র ধরে না। তারা বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় অন্যায়ের মুখোমুখি।

প্রস্থানবাণী

আবু সাঈদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল একেকটি শিক্ষা-সহজতায় সৌন্দর্য, সাহসে নেতৃত্ব, আর আত্মত্যাগে অমরতা। সে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে স্বপ্ন দেখা যায়, কীভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয় এবং কীভাবে মৃত্যুর মধ্যেও বেঁচে থাকা যায় লক্ষ কোটির হৃদয়ে। আজ সে শারীরিকভাবে আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তার আদর্শ, তার সাহস, তার আত্মিক প্রজ্ঞা প্রতিটি তরুণের মনে ছড়িয়ে গেছে দীপ্ত হয়ে।

তার স্মৃতি শুধু চোখের জল নয়, তা আমাদের জেগে ওঠার ডাক। শহিদ আবু সাঈদ আমাদের পথপ্রদর্শক, আমাদের বিবেকের আয়না। আমরা যারা তার সাথি ছিলাম, যারা তার বন্ধু ছিলাম, আমাদের কর্তব্য এখন তার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখা। সেই সমাজ গড়া, যেখানে সত্য আর ন্যায়ের কণ্ঠ কখনো গুলি কিংবা নির্যাতনে রুদ্ধ করা যাবে না।

শহিদ আবু সাঈদ, তুমি নেই, কিন্তু তুমিই আছো আমাদের সাহসের ছায়ায়, আন্দোলনের কণ্ঠে এবং ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায়।

"তোমার শূন্যতাই আজ আমাদের প্রেরণা। তোমার আত্মত্যাগ আমাদের দিশারি।"

স্মৃতিচারণ
আবির রহমান*

২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের কোটা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, যা মূলত ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ থেকে উৎখাত করেছিল। এ প্রেক্ষাপটকে কী বলে?

জুলাই বিপ্লব? জুলাই অভ্যুত্থান? জুলাই আন্দোলন?

আমি মনে করি জুলাইতে যার যেরকম ভূমিকা ছিল, তার কাছে জুলাইকে তেমনি মনে হয়।

যাই হোক, আমার কাছে জুলাই মানে বিপ্লব। এখানেই ফুলস্টপ।

চলুন মূল ঘটনায় আসি,

আমি সত্যি কথা বলতে, শুরুর দিকে (যখন ছোট ছোট হরতাল ও ধর্মঘট শুরু হয়) কোটা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলাম না। কারণ, ঐ সময়ে আমি আরও বড় ২টা সমস্যা দেখতে পাচ্ছিলাম, তা হলো:

ক. ভারতকে করিডর, মোংলা বন্দর দেওয়া।
খ. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি।

আমি সবসময় ভাবতাম, এবার হয়তো আমাদের স্বাধীন সার্বভৌমত্বটুকু হারাতে বসেছি। তাছাড়া, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে একবার কোটা আন্দোলন হয়েছিল, সেটার দাবি শেখ হাসিনা মেনেও নিয়েছিল। শেখ হাসিনার একটা বড় গুণ ছিল, সে ছোট ছোট ইস্যুগুলো দিয়ে বড় ইস্যুগুলো ঢেকে দিত।

সেজন্য শেখ হাসিনা ভারতকে করিডর, আর মোংলা বন্দর দেওয়ার ইস্যুটার ফোকাস অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য কোটার ইস্যুটা সামনে নিয়ে আসে।তবে, আমার বন্ধু সালমান (ছদ্মনাম), এ আন্দোলনের সাথে শুরু থেকেই একটিভ ছিল।

জুলাই ১-৩

সালমানের সাথে আমার আন্দোলনের বিষয়ে কোনো কথা হয়নি। জাস্ট, সে তার ইচ্ছেমতো যাইত আর আসত।

জুলাই ৪

সালমানের সাথে আমার কোটা আন্দোলন নিয়ে টুকটাক কথা হতে লাগল।

সালমান বলল: চলো আন্দোলনে যাই।

আমি বললাম: কী করে যাব, দেশে এখন প্রধান ৩টা সমস্যা বিদ্যমান। সেগুলো বাদ দিয়ে আমরা খালি খালি চিন্তায় আছি। দুইদিনপর ঠিকই শেখ হাসিনা সবকিছু মেনে নিবে। আর আমরা ভারতের দাসত্ব গ্রহণ করব।

সালমান বলল: তাই বলে তুমি তোমার অধিকার রক্ষায় কোনো ভূমিকা রাখবে না?

---

*শিক্ষার্থী,ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

আমি বললাম: আমার ভাই, চাকরি করার কোনো ইচ্ছে নেই। যদি কখনও হাসিনা পতনের আন্দোলন হয়, তখন ডাক দিও।

সালমান বলল: ও আচ্ছা।

জুলাই ৫

সালমান অন্যান্য দিনের মতো একাই আন্দোলন করে আবার ফিরে আসে।

আমি বললাম: কী খবর? আজকের আন্দোলনের আপডেট কী?

সালমান বলল: এইতো মোটামুটি অনেকে শিক্ষার্থী আসছিল। কালকে থেকে তুমিও চলো।

আমার কী মনে হলো জানি না, আমি সালমানের কথা ফেলতে পারলাম না। বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, কাল থেকে আমিও যাব। যাওয়ার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে যেও।

সালমান বলল: আচ্ছা।

জুলাই ৬

সালমান সকাল ১০টার দিকে এসে আমার রুমে নক করল। বলল রেডি হও। আমি বললাম ওকে আমি ২ মিনিটে রেডি হচ্ছি। তার সাথে ঐদিনের কর্মসূচি শেষ করে রুমে ফিরলাম।

জুলাই-৭

"মর্ডান ব্লকেড" কর্মসূচি ছিল। এইদিনও সালমানের সাথে আমি মিছিলে গেলাম। স্লোগান ছিল,

কোটা না মেধা,
মেধা..... মেধা.......
আপস না সংগ্রাম
সংগ্রাম..... সংগ্রাম......

স্লোগানগুলো সামাজিকবিজ্ঞান বিভাগের ১৫ ব্যাচের জয় যখন বলত, গায়ের পশম শিউরে উঠত। যাই হোক দীর্ঘক্ষণ, মর্ডান ব্লকেড রাখায় রাস্তায় পুরো জ্যাম তৈরি হলো। দুপুর আনুমানিক ১টার দিকে, ছাত্রলীগের সভাপতি পোমেল আসলো। এসে বক্তৃতা দিল।

পোমেল বলল: আচ্ছা আপনারই বলেন, এভাবে রাস্তাঘাট আটকিয়ে, জনমানুষের কষ্ট দিয়ে কি আন্দোলন সফল করা যায়?

সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলল যায় না মানে? ন্যায্য অধিকার তাহলে কীভাবে আদায় করে? এরই মাঝে কে একজন যেন বলে উঠল "ভুয়া-ভুয়া"। এখন, সবাই পোমেলকেউদ্দেশ্য করে ভুয়া ভুয়া স্লোগান দিতে শুরু করল। তারপর সবাই একটু নীরব হলে, পোমেল বলল: ঠিক আছে, ভাইয়েরা। আজকের মতো আন্দোলন এই পর্যন্তই হলো। এখন, সবাই যার যার মেসে যায়।

সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলল আন্দোলনে আসছি আমরা নিজেদের ইচ্ছায়। আমরা এখান থেকে যাবও নিজেদের ইচ্ছায়। আমরা আমাদের ব্লকেড কর্মসূচি চালিয়ে যেতে লাগলাম।তার কিছুক্ষণ পরেই, প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তাসহ ছাত্রলীগের পান্ডারা আমাদেরকে জোর করে আন্দোলনটি বন্ধ করে দেয় এবং সেদিনের মতো আমরা আমাদের আন্দোলন স্থগিতকরে চলে যাই।

জুলাই ৮

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন ব্যাপক ছড়িয়ে পড়ে।

জুলাই ৯-১৩

এই দিনগুলোর মাঝেও কয়েকটা আন্দোলন হয় এবং আন্দোলন সারা দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

জুলাই ১৪

প্রেস ব্রিফিং:

এক তৈলাক্ত হলুদ সাংবাদিকশেখ হাসিনাকে প্রশ্ন করল। প্রশ্নটা অনেকটা এরকমসাংবাদিক বললো আচ্ছা ম্যাডাম, আমার কাছে যদি ২জন চাকরিপ্রার্থী সমপরিমাণ মার্ক নিয়ে ভাইভায় আসে, একজন রাজাকারের সন্তান, আরেকজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। আমি কি অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে বেছে নিব? শেখ হাসিনা বলল অবশ্যই।.....তার মানে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানেরা মেধাবী না, যত মেধাবী ঐ রাজাকারের বাচ্চারা।

এরপর আনুমানিক ঠিক রাত ১০টার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জসীমউদ্দিন হলের ভাইয়েরা হলের লাইট বন্ধ করে দিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করল।

আমি কে? তুমি কে?

রাজাকার, রাজাকার।

আর এই স্লোগানের ভিডিও মুহূর্তের মধ্যেই সোশ্যালমিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। তারই ধারাবাহিকতায় সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্দোলন শুরু করে। তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার। ঐ রাতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যত শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে এসেছিল, আমার মনে হয় না, অত শিক্ষার্থী কখনও ১৪ জুলাই এর পূর্ব ঐরকম আন্দোলন করেছিল। সেই রাতে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়াও হয়েছিল।

জুলাই ১৫

ছাত্রলীগ তাদের রংপুর অঞ্চলের (মহানগর, কারমাইকেল ও বেরোবি) সকল শাখায় একত্রিত হয়ে মিছিল করতে থাকে। আমরা সেইদিন রাজপথে নামতে পারেনি। তারা এই দিনে রাস্তায় যারাই নামতে চেয়েছিল তাদেরকেই আঘাত হেনেছিল এবং রাতের বেলা যখন ফেসবুক দেখি "ঢাকা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর স্টিমরোলার চালানো হয়েছে"। দেশের বিভিন্ন কলেজের ছোট ভাই-বোনদেরকে রক্তাক্ত করে ফেলা হয়েছে। তখন, মনের অজান্তেই চোখ দিয়ে ছলছল করে পানি পড়ছিল। ঐদিন হৃদয়বিদারক একটা কথা শুনেছিলাম। সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আপু বর্ণনা করেছিলেন,ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা যখন ঢাবির ভাইদেরকে মারতে থাকে, তখন একজন ছোটভাই পালিয়ে গিয়ে এক আপুর কাছে আশ্রয় চাইছিলেন, ঐ আপু ছোট ভাইকে তার পরিত্যক্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন, বাট ঐ জানোয়ারেরা সেখান থেকে ঐ ভাইকে নিয়ে গিয়ে রড দিয়ে পিটিয়েছে। এই ছিল আমাদের জুলাই।

জুলাই ১৬

সারাদেশের বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইদের ওপর নৃশংস হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন হয়। এই মিছিলে রংপুরের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী একত্রিত হয়। মিছিলটি সম্ভবত জাহাজ কোম্পানি থেকে শুরু হয়, আমরা লালবাগ থেকে মিছিলে যোগ দেই, কারণ পার্কের মোড়ে পুলিশের শক্ত অবস্থান ছিল। এরপর মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেটে অবস্থান নেয়। গেটের সামনে পুলিশের অবস্থান আর গেটের ভিতরে লীগের অবস্থান। ঐ সময়ে, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ১নং গেটের পিছন থেকে মিছিলের দিকে ইটপাটকেল মারতে শুরু করে, এটার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের কিছু শিক্ষার্থীরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। আর তখনি পুলিশ মিছিলের দিকে গুলি ছোড়া শুরু করে। তারপর সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ারসেল ও গ্যাস একের পর এক নিক্ষেপ করতে থাকে। আমাদের মিছিলটি বানচাল হয় যায় এবং ৩টি সাইডে বিভক্ত হয়ে যায়।

এমনি সময়ে আবু সাঈদকে লক্ষ্য করে পুলিশ কয়েক দফায় গুলি করে এবং সাঈদ সেখানেই লুটিয়ে পড়ে এবং হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই আমাদের সাহসী বীর আবু সাঈদ শহিদ হয়ে যায়। ঐদিন আরও অনেক ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছিল।

জুলাই ১৭

সবাই একে একে বাড়ি যেতে লাগল। এমনকি যারা সমন্বয়ক ছিল, তারাও। আমার মনে আছে ৯০% স্টুডেন্ট বাড়ি চলে গিয়েছিল। আমার ভাইবোনদেরকে খুব করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, ও আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা তোমরা চলে যেও না। তোমাদের ভাই গতকাল শহিদ হয়ে গিয়েছে। রক্তের বদলা না নিয়ে তোমরা কেউ ফিরে যেও না। আর না গিয়ে বা কি করার ছিল। জীবনের এত ঝুঁকি নিয়ে কেউ বা থাকতে চাইবে। মেসগুলোতে সব রেড (তল্লাশী) দিয়ে দিছিল। এমনকি আমিও বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, বাসে উঠার পূর্বমুহূর্তে আব্বুকে ফোন দিয়েআমি বললাম। আমি কি চলে আসব? সবাই তো চলে যাচ্ছে। আব্বু: দেখ কাল তোমারই বন্ধু শহিদ হয়েছে। আজকে তুমি চলে আসলে, তোমার বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হবে না? (আমারে আর পাই কে? আমি মনে হয় পৃথিবীতে ঐদিন সবচেয়ে আনন্দিত মানুষ ছিলাম)। আচ্ছা ঠিক আছে, আব্বু আমারা জন্য দোয়া করিয়েন।ওই সময়ে ছোটভাই আলভিরকে ফোন দিলাম যে,ভাইয়া আপনার ওখানে থাকা যাবে কী না?আলভির বলল কোনো সমস্যা নেই ভাই, চলে আসেন।আমিও আমার তল্পিতল্পা নিয়ে গলাকাটা বাসায় গিয়ে উঠলাম (আলভির অ্যাকাউন্টিং বিভাগের ছাত্র ছিল। আমার এক ব্যাচ জুনিয়র,সে গলাকাটা এবং আনসারির মোড়ের মাঝামাঝি একটা চারতলা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকত)।পরবর্তীতে ক্যাম্পাসে শহিদ আবু সাঈদের গায়েবানা জানাজার নামাজ আদায় করা হয়।

জুলাই ১৮

রংপুরের সকল শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণ জনতা নেমে এলো। মডার্নে ছাত্রজনতার সাথে কয়েক দফায় হামলা-পাল্টা হামলা চলতে থাকে। এই দিনে পুলিশের যখন রসদ ফুরিয়ে যায়, তখন কৌশলে তারা অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে রসদ নিয়ে আসার চেষ্টা করে।

জুলাই ১৯

বিএনপির আন্দোলন ছিল। বিএনপির সাথে ছাত্রজনতাও ছিল। এই দিনেও পুলিশের সাথে সাধারণ ছাত্রজনতার ব্যাপক সংঘর্ষ হয়।

জুলাই ২০-২৬

রংপুরে ১৯ তারিখের পর আর কোনো আন্দোলন হয়নি। তারপর ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীও মাঠে নামে। অনেকে চেষ্টা করার পরও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে এই রাতগুলো ছিল অনেক ভয়ংকর। কারণ, সারাদেশে বিশেষ করে শহরের বাড়িগুলোতে রেড (অভিযান) দেওয়া হচ্ছিল। স্টুডেন্ট পাইলেই তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিদিন রাতে মনে হতো এই বুঝি পুলিশ চলে আসল। তবে স্বস্তিরও কিছু জায়গা ছিল। যেমন, সিদ্দিক ভাই আমাদেরকে নানা গল্প বলে মোটিভেট করত। ছোটভাই আলভির এবং সিয়ামের সাথে প্রতিদিন বিকালে ঘুরতে বের হতাম।মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা ইনশিরার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠত।

জুলাই ২৭

আন্দোলন না হওয়ার কারণে বাড়িতে চলে আসলাম।

জুলাই ২৮

ইন্টারনেট পূর্ণাঙ্গরূপে চালু হলো। বাট চালু হওয়ার পর যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে একটাই উপলব্ধি হলো। মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে। কী নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে, এদেশের ছাত্র-জনতার ওপর।

আগস্ট ২

রংপুরে পুনরায় আন্দোলন শুরু হলো এবং তৎকালীন শিবিরের সভাপতি সোহেল ভাই একটি সমন্বয়ক প্যানেল তৈরি করলেন, সেখানে আমার নামটাও ছিল এবং তিনি আমাকে রংপুর যেতে বললেন। আমি সারারাত চিন্তা করলাম যাব কি না?

আগস্ট ৩

অবশেষে আল্লাহর ওপর ভরসা করে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমার অনার্স লাইফে বহুবার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি, কিন্তু এইদিনে আমার মাকে বিদায় জানাতে অনেক বেশি কষ্ট হয়েছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম, আল্লাহ আমি যেন আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে আসতে পারি।

আগস্ট ৪

ছাত্রলীগের অন্তিম দিন। এইদিন ওদের মাঠে নামাই লাগত, কারণ এইদিনই ছিল অস্তিত্ব রক্ষার দিন। কিন্তু তারা অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি, বরং তাদের ৭ জন কর্মী নিহত হয়।

আগস্ট ৫

রাজপথে নামার চেষ্টা করেছিলাম, বাট পারি নাই। কারণ অধিকাংশ মানুষ ঢাকায় চলে যায় এবং এই দিনের আন্দোলন সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষই অবগত ছিল না।

২৪-এর আন্দোলন: একটি শিক্ষক, একটি হৃদয় ও একটি জাতির লড়াই

মোঃ সোহেল রানা*

আলোর বিপরীতে দাঁড়ানো অন্ধকার

২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের কোটাসংস্কার আন্দোলন-এটি কেবল একটি রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, বরং এটি ছিল একটি জাতির আত্মার পুনর্জাগরণ। একজন শিক্ষক হিসেবে আমি কখনো কল্পনাও করিনি যে একদিন আমাকে রাজপথে দাঁড়াতে হবে। আমার ছাত্রদের পাশে, চোখে চোখ রেখে অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে হবে। কিন্তু ইতিহাস যখন ডাক দেয়, তখন নীরব থাকা পাপ।

শিক্ষার্থীদের ওপর যখন নির্মম নির্যাতনের খবর আসছিল চারদিক থেকে, নৈতিক প্রতিরোধকে পেশিশক্তির জোরে থামিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছিল, তখন আমি আর চুপ থাকতে পারিনি। ভিতর থেকে এক নৈতিক তাড়না আমাকে নাড়িয়ে দেয়। আমি প্রতিবাদের পক্ষেই দাঁড়াই।

১৬ জুলাই: এক প্রতীকী সূচনা

১৬ জুলাই যাত্রাবাড়ী কাজলার মোড়ে ছাত্রদের সমর্থনে একটি মিছিলে ছাত্রদের কাঁধে কাঁধ রেখে দাঁড়াই। সেই ছবি আমি ফেসবুকে পোস্ট করি। তা দ্রুত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আমি বুঝতে পারি-শিক্ষক হিসেবে আমার অবস্থান আজ শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ নয়; রাজপথেও আমার জায়গা আছে, কারণ ওখানেই আজ শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি।

১৮ জুলাই: রাজপথে প্রথম পদচারণা

১৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার, আমি সরাসরি আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করি। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার কলেজের রাফি, আবির, ইডেন কলেজের সুমি, উদয়নের নাবিল এবং অসংখ্য ছাত্র-জনতা।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় পুলিশ আমাদের ওপর গুলি, সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার গ্যাস ছুড়ে হামলা করে। চারদিকে ধোঁয়া আর আতঙ্ক। চোখে জ্বালা, বুক কাঁপে, তবুও আমরা পিছু হটিনি। আমি এক পর্যায়ে একটি ঘরে আটকে পড়ি। ঘরের ভেতর থেকে বাইরে পুলিশের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল, বুঝি এখনই দরজায় লাথি মেরে গুলি করে মেরে ফেলবে।

চার ঘণ্টা পর পরিবেশ কিছুটা শান্ত হলে আজিমপুর ত্যাগ করি। পরে বুঝলাম, শুধু আজিমপুর নয়-সমগ্র ঢাকা জ্বলছে। যেন পুরো শহর এক পুড়ে যাওয়া মানচিত্র।

১৯ জুলাই: কারফিউ আর আতঙ্কের রাত

সরকার কারফিউ জারি করল। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমনের নামে শুরু হলো বিরোধী দল-মত নিধনের অভিযান। আমাদের বাসাতেও পুলিশ হানা দেয়, কিন্তু কাউকে খুঁজে পায় না। আশপাশে শুরু হয় 'গ্রেপ্তার বাণিজ্য'। DMRC এর শিক্ষক সাইদুর রহমান স্যার, জুয়েল স্যার ও বেলাল স্যার-সবাই ভয় উপেক্ষা করে আন্দোলনে অংশ নিতে থাকলেন।

২৪-২৫-২৬ জুলাই: রাজপথে দৃঢ়তা

২৪ জুলাই বকশীবাজারে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শামীম স্যারের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নিই। উনার সাহসিকতা আমাকে আলোড়িত করে।

---

*শিক্ষক, গণিত বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি কলেজ (বুয়েট ক্যাম্পাস), ঢাকা।

২৫ জুলাই, রাস্তায় মানুষ ও যানবাহন শূন্য। আমি বুক পেতে দাঁড়িয়ে ছবি তুলি- "বুক পেতেছি গুলি কর, বুকের ভিতর ভীষণ ঝড়"। এই ছবিটি সামাজিক মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

২৬ জুলাই, বড় ভাই প্রফেসর ডক্টর কাশেম ভাই, বাবা-মা আমার ছবিটি দেখে শঙ্কিত হন। বন্ধু-বান্ধব খোঁজ খবর নিতে থাকেন। ফলে আমি আর পিছু হটতে পারি না।

২৯ জুলাই: রক্তে লেখা প্রতিবাদ

সেদিন আমরা যাত্রাবাড়ীর একটি সড়ক সম্পূর্ণ অবরোধ করি। পুলিশের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে কিছু মানুষ গুলিবিদ্ধ হন, কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেন। রাজপথ রঞ্জিত হয় রক্তে।

৩০ জুলাই: একটি শিশু, একটি স্লোগান

সেদিন আমি আমার তিন বছরের ছেলে আয়ানকে নিয়ে আন্দোলনে যাই। সে স্লোগান দেয়-একটা পবিত্র, নিষ্পাপ কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা। একসময় তাকে বাসায় রেখে আমি রাজপথে ফিরে যাই। বুকে বিশ্বাস ও পেছনে একটি বিদায়ের অনুভব।

৫ আগস্ট: মৃত্যু না মুক্তি

আগের রাতে বাবা ফোনে বললেন, "বাবা, কালকে বের হইও না।" আমি বলেছিলাম-"বাবা, ধরো তোমার একটা ছেলে মারা গেছে, কিন্তু সে ছাত্র-জনতার সাথে বেইমানি করেনি। আমার মৃত্যু হলেও তুমি গর্ব করে বেঁচে থাকতে পারবে "

ডিএমআরসির (আপন, নিরব ও সাজ্জাদ) ছাত্রদের সঙ্গে বসে আমি বাবার সঙ্গে লাউডস্পিকারে কথা বলি। হয়তো আমার কথাগুলো কারো কাছে পাগলামি লাগতে পারে, কিন্তু আমি জানতাম-এই দেশটা পাগলদেরই জন্য স্বাধীন হয়েছে। স্বৈরাচারমুক্ত হয়েছে। পাগল না হলে কি কেউ মৃত্যুর মিছিলে যায়? যেতে পারবে?

সকালবেলায় আমরা মিছিল নিয়ে কাজলা মোড় অতিক্রম করি। গুলিবর্ষণ শুরু হয়। আমার পাশেই একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে। তাকে মসজিদের পাশে রেখে চিকিৎসা দিই। এরপর আমরা যাত্রাবাড়ী থানা ঘেরাও করি। গুঞ্জন ওঠে-সেনাবাহিনী গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

হঠাৎ করেই ছড়িয়ে পড়ে- "শেখ হাসিনা পালিয়েছে"। আমাদের মিছিল ছড়িয়ে পড়ে পুরো শহরে। শাহবাগে বিজয়ের আনন্দে সবাই উচ্ছ্বসিত। আমি জানি, এই ইতিহাস কেউ সহজে ভুলবে না।

শেষ কথা:

যে আগুন এক শিক্ষক জ্বালিয়ে ছিলেন...

আমি তখনো শিক্ষক ছিলাম, এখনো আছি। তবে সেই আন্দোলনের সময় আমি কেবল গণিত শেখাইনি, আমি শিখেছি ও শিখিয়েছি- ন্যায় কী? অন্যায় কী? ভয়কে কীভাবে অতিক্রম করতে হয়।

আমার চোখে আন্দোলন মানে কেবল ব্যানার, মিছিল নয়-এটি একটি আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া, যেখানে তুমি নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য দাঁড়াও।আমি গর্বিত, আমি ছাত্রদের পক্ষে ছিলাম। হয়তো এই গর্বই আমার সবচেয়ে বড় অর্জন।

স্মৃতিতে ১৬ জুলাই

রহমত আলী*

১৬ জুলাইয়ের রাতে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের দমন পীড়ন দেখে সারারাত ঘুমাতে পারিনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে আন্দোলনের বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বলে বেরিয়ে পড়ি পার্কের মোড়ের উদ্দেশ্যে। লালবাগ পৌঁছাতেই যুবলীগ চ্যালাপ্যালারা রাস্তা আটকাচ্ছিল। তাই অটো থেকে নেমে হাঁটি বাকি পথটুকু।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪নং গেইট আসতেই চোখে পড়ে সামনে ভয়াবহ তাণ্ডব। সাউন্ড গ্রেনেড, গুলি, টিয়ারসেল এর শব্দ। ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া।

এর মধ্যে একটু এগোতেই এক বোনের পাশে এসে লাগে ইটের টুকরো। আহত বোনকে নিরাপদে এক বান্ধবীর মেসে রেখে আসতেই শুনি একজনের গুলি লাগছে।

আবু সাঈদের রক্তে ভেজা মাটিতে দিনব্যাপী লড়াই শেষে সন্ধ্যায় গাড়ি গাড়ি পুলিশ-বিজিবিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় পুরো রংপুর শহর।

জরুরি সিন্ডিকেটে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা করে আবাসিক হল খালি করে দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের চাপ দেওয়া হয়। জুলাইয়ের এই সন্ধ্যা এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ পুরো রংপুর। কিন্তু ততক্ষণে সাঈদ এর শহিদি অনুপ্রেরণা সারাদেশে সবার মাঝে সাহস হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে অনেক রক্ত ও বিসর্জনের পর আমরা নতুন বাংলাদেশ পেলাম। আবু সাঈদের স্বপ্নপূরণই আমাদের অন্যতম প্রত্যয়।

---

* শিক্ষার্থী, কম্পিউটারসায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংবিভাগ, বেগম রোকেয়াবিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

জুলাই এর স্মৃতিচারণ

মোঃ রোবায়েদ হাসান*

প্রথমেই বলে রাখি আমি মুক্তিযুদ্ধ, ’৫২ দেখিনি। ’২৪ দেখেছি, প্রতিটি রাত কীভাবে কেটেছে তা আমি জানি। রাত বারোটার ঘড়িতে টিকটিক শব্দ বেজে উঠছে, আর মাথায় দেশ ও জাতির চিন্তা। আমি জানালার ধারে বসে, চোখে ঘুম নেই। রাজনীতি আমাকে কখনোই টানেনি, কিন্তু প্রতিবাদ? সেটার সঙ্গে আমার আত্মা চিরকালই যুদ্ধ করেছে। ৫ জুন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলামকোটা পূনর্বহালের রায় দিয়েছে, কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না। ভাবছি “এই দেশ তো এমনই, এখানে কিছুই বদলায় না। আমি বরং বিদেশে যাওয়ার প্ল্যানটাই করি।” ২০১৮ এর আন্দোলন দেখলাম সব বুঝি, ১৯ সক্রিয়ভাবে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন করলাম, কলেজ থেকে বের করে দেওয়ারভয় দেখানো সত্ত্বেও।

কিন্তু সময় কি কখনো কারো পরিকল্পনার অপেক্ষা করে?

৩০ জুন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রংপুরে কোটাবিরোধী আন্দোলন প্রাথমিক সূত্রপাত হয় শামসুর রহমান সুমন, শাওন আরও কিছু মানুষের হাত ধরে। ৪ জুলাই আপিল বিভাগ রায় দিলে মূল আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তখনও এত মনোযোগ নাই মাঠে।

৫/৬ জুলাই আমার বিতর্ক ক্লাবের জুনিয়র হালকা কটাক্ষ করে “ভাই, সিনিয়ররা তো কিছুই করে না।” আমরা জুনিয়ররাইসব করছি। আপনাদের এগুলো নিয়ে চিন্তা নাই। খালি ফেসবুকে লিখলে হবে। সে জানে না, যখন থেকে বুঝতে শিখেছি নিজের সামর্থ্য অনুয়ায়ী প্রতিবাদ ও রাজপথে থেকেছি। বয়স তো আগে কম ছিল।

সেদিন থেকেই মনে একটা তীর বেঁধে যায়।

সেই তীরই আমাকে টেনে নিয়ে যায় আন্দোলনের ভেতরে, যেখানে স্লোগান ওঠে।

৭ জুলাই সারা বাংলাদেশের মতোঢাকা ও রংপুর মহাসড়ক ব্লকেড হয়। বাংলা ব্লকেড কর্মসূচি পালন হয়।

সেখানে বেরোবি ছাত্রলীগ সভাপতি পোমেল বাধা দিতে আসলে “ভুয়া ভুয়া” স্লোগান দেয় সাধারণ ছাত্ররা।

তারপর শুরু ছাত্রলীগের চোখ রাঙানি, বিভাগের শিক্ষার্থীদের ওপর নজরদারি– সবকিছুই আমাকে আরও জেদি করে তোলে।

৮ জুলাই দাবি ওঠে সংসদে আইন করে কোটা বাতিল করতে হবে– এটাই ১ দফা।

সরকারের প্রতিক্রিয়া? নির্লজ্জ নীরবতা।

আমার চোখে ভেসে ওঠে পুরনো দিনগুলোর দৃশ্য ২০১৮ এর রাত, ভোট ডাকাতি, খাদিজাতুল কুবরার কান্না, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের শাহবাগ, আর কতকাল এই অত্যাচার, একটা স্লোগান আমার মনে পরে “গোপালগঞ্জের গোলাপি আর কতকাল জ্বালাবি”।

---

*শিক্ষার্থী, গণিত বিভাগ, ১২তম ব্যাচ, বেগম রোকেয়া বিশবিদ্যালয়, রংপুর।

তার ঘৃণা, তার অভিমান, তার প্রতিবাদসব একসূত্রে গাঁথা হয়ে যেন নতুন রক্ত খুঁজে পায়।

১১ জুলাই আমরা ক্যাম্পাস থেকে মিছিল বের করতে চাই, সেদিন সকালে আমি সাঈদ সহ বেশ কয়েকজনকে সকালে থেকে ছাত্রলীগের সভাপতি ভয় দেখায়, গোয়েন্দা পুলিশ ও পুলিশ প্রশাসনের কথা বলে। আমরা কিছুই মানি না। কিন্তু ছাত্রলীগ মিছিলে বাধা দেয়, প্রক্টরের গায়ে হাত তুলার মিথ্যা অভিযোগ তুলে আবু সাঈদকে চড় মারে।

কিন্তু আমরাপিছু হটি না, আমরা স্বাধীনতা স্মারকে বসে ওপেন মিটিং করি, নিজেদের কণ্ঠে বলি, "ভয় নয়, প্রতিবাদ!" কে সামনে থাকবে কে পিছনে সব ঠিক করি। আমার জেদ একটি স্বাধীন দেশের নাগরিকের সকল মৌলিক অধিকার বছরের পর নষ্ট করার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠে। সেদিন জন্মদিন ছিল আমার। ছাত্রলীগ জন্মদিনের শুভেচ্ছাইনবক্সে জানিয়ে ভালো হয়ে যেতে বললো।

১৪ জুলাই আমরা ডিসি অফিস অভিমুখে পদযাত্রা করি। সেই রাতেই স্বৈরাচারী নির্লজ্জ হাসিনা আমাদের রাজাকার বলে, তার প্রতিবাদে স্লোগানে রংপুর শহর গর্জে ওঠে বেরোবিয়ানদের কণ্ঠে।

সেই রাতে সাহসী মেয়েরা হলের তালা ভেঙে রাস্তায় নামে।

ইতিহাস লেখা হয় রক্ত আর স্লোগানের ছাপে। আমরা ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে কিছুক্ষণ অবস্থান নিয়ে ক্যাম্পাসে ব্যাক করে তা দখলে নিই। আমরা ছাত্রলীগের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি, তাও আমরা ক্যাম্পাসে শান্তভাবে অবস্থান করি। স্বৈরাচারের দালালরাই উল্টো ঢিল মেরে আমাদের একজনের মাথা ফাটিয়ে দেয়। আমার কাধে ঢিল লাগে। সবাই ক্ষেপে যায়। তাও নেতৃস্থানীয় আমরা সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করি। যাতে পরিস্থিতি হিতে বিপরীত না হয়।

তবে ১৫ জুলাই...

দালালেরা অস্ত্র নিয়ে আসে, টোকাই ভাড়া করে তাড়া দেয় রামদা হাতে নিয়ে। পুলিশ প্রশাসন নীরব দাঁড়িয়ে থাকে। যেভাবে অন্য সময় থাকে। ক্যাম্পাসে টোকাইরাআমাদের বোনদের নোংরা ভাষায় যার দেখা পায় তাকেই কটাক্ষ করে।

আত্মরক্ষায় সরে যায় সবাই, কিন্তু মন স্থির রাখি "এ লড়াই পিছিয়ে আসার নয়।"

১৬ জুলাইয়ের সকালটা অন্যরকম। এতদিন আমরা একাআন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছি।

আমরা এইবাররংপুরের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে "রাজপথে নেমে আসার আহ্বান জানাই"। আমরা নিজেদের মতো করে প্লান সাজাই। ঢাকার সাথে কোনো মিল নাই। আমরা আগের রাতে প্লান করি, আমরা যে সময় ঘোষণা দিব তার চেয়ে সময় হঠাৎ করে এগিয়ে নিয়ে আসব। আর মিছিল শহরের দিক থেকে শুরু করব। তাহলে প্রশাসন ভ্যাবাচেকা খাবে। আমাদের আটকাতে পারবে না। তাই হয় আমরা সফল হই।

আর সেদিন...

সেই সাহস আর স্বাধীনতার দাম মিটাতে হয় শহিদ আবু সাইদের রক্ত দিয়ে। নিরস্ত্র ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে পুলিশ বিনা ওয়ার্নিং এ ফায়ার করে। অথচ উস্কানি দিচ্ছিল ভেতরে থাকা ছাত্রলীগের টোকাইরা।

আমরা ফুঁসে উঠি। বিকালের মধ্যেই সব আমাদের দখলে চলে আসে, সব স্বৈরাচারের কুকুর ভয়ে জঙ্গল দিয়ে পালায়।

একজন গরিব ছেলেকে, যে দিনে টিউশনি করে রাতের ভাত জোগায়, যে আন্দোলনের দিনে বলত

"টিউশনে না গেলে পেট চালাব কীভাবে ভাই?"

তার রক্তে রাঙা হয় আন্দোলনের মাটি।

তার মা'র আহাজারি বাতাস কাঁপায়।

আমার বুকের ভিতর কেঁপে ওঠেতার মায়ের আর্তনাদ "আমার ছেলেক মারলু ক্যানে?"

সেই দিন, আন্দোলন আর প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে আমি বুঝে ফেলি, ১ বছর আগে যে পোস্ট দিছিলাম বিপ্লবই একমাত্র সমাধান তার সময় হইছে।

"স্বৈরাচার পতনের এক দফা ছাড়া আর কোনো পথ নেই।"

১৮ জুলাই রংপুরের মানুষের ঢল নেমে আসে রাজপথে। স্বৈরাচারের পোষা কুকুররা ম্যাসাকার করে।

২১ জুলাই ওয়ার্নিং পেয়ে নিরাপদে বলে যাই। সকল জায়গা থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন নেট নাই। কারফিউ চলমান।

২৩ জুলাই সরকার নতুন কোটা পদ্ধতির প্রজ্ঞাপন জারি করে। তাও আন্দোলন থামে না।

২৬ জুলাই কেন্দ্রীয় সমন্বয়কদের তুলে নিয়ে যায়। তারা দাবি মেনে আন্দোলন স্থগিত করছে এইটা যখন প্রচার করে। গোয়েন্দারা আমাদের রংপুরের বেরোবির সম্মুখসারির আন্দোলনকারীদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে। যাতে আমরাও সরকারের পক্ষে বক্তব্য দিই। তাদের সুর থাকে এমন ঢাকার ওদের কিছু হবে না। আমাদের মেরে ফেললেও কিছু যায় আসে না। তাই এইসব যেন বাদ দিই। কিন্তু আমরা কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে সময় নিই।

এর মধ্যে রংপুরে নেতৃত্বের অভাবে আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়ে। আমরা যারা পূর্বে থেকে ছিলাম আমাদের ওপর নজরদারি রাখে, তাই কিছুটা ঝামেলায় পড়ি, পরবর্তীকালে পিছনে থাকা আরও কিছু বিপ্লবী উঠে আসে।

আমরা তাদের সাথে ৪ আগস্ট ১ দফার পক্ষে অবস্থান নিই।

৫ আগস্ট /ইতিহাসিক ৩৬ জুলাই দলমত নির্বিশেষে সবার সংগ্রামে স্বৈরাচারের সূর্য অস্ত যায়।

কিন্তু যে স্বপ্ন আমি চোখে দেখেছিলাম সেই মুক্তির আলো এখনো আসে নাই।

আমি এখন লড়ছি একটা নতুন বাংলাদেশের আশায়। যার স্বপ্ন দেখেছিলাম, দেখেছিল শহিদ আবু সাইদ সহ ২০০০ (দুই হাজার) শহিদ।

এই পথ থেমে গেলে ইতিহাস থেমে যাবে না, কিন্তু সম্মান হারাবে জুলাই।

জানালার পাশে বসে আমি এখনো ভাবি।

শাহবাগের রাত, খাদিজার বন্দি, ১৮ এর ভোট, গুম, খুন, আর ২০০০ (দুই হাজার) সাঈদের রক্ত...

সব মিলিয়ে সে এক অদ্ভুত গল্প।

পাঠ্যবইয়ে না ছাপানো হলেও,লেখা থাকবে এই দেশের ইতিহাসে, এইবার এই ত্যাগগুলোর কি মূল্যায়ন হবে? দেশ কি এগোবে? হতাশ হয়েও নিজেকে টিকিয়ে রাখি। আমি দেশকে নিয়ে আশাবাদী হতে চাই।

কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা, বন্দিশালার ঐ শিকল ভাঙা। তারা কি ফিরবে আজ? ফিরবে অবশ্যই তাদের স্বপ্নের বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে।

স্লোগান ছিল তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার, কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার।

মোঃ আরমান হোসাইন*

সময় ১৪ জুলাই ২০২৪

দীর্ঘ কয়েকদিন কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালীন ১৪ জুলাই ফ্যাসিস্ট হাসিনা যখন আমাদের রাজাকারের বাচ্চা বলে গালি দিল, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা বাংলাদেশ প্রতিবাদ জানায়। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরা হল প্লাস মেসগুলো থেকে সবাই একত্রিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ক্যাম্পাস থেকে মর্ডান মোড়ের দিকে মিছিল নিয়ে যাই। সেই মিছিল নিয়ে আবার ক্যাম্পাসে আছি সেদিন ও আমাদের মুখোমুখি অবস্থান হয় তারা লাঠিসোটা নিয়ে আমাদের দিকে বারবার ফিরে আসে।

১৫ জুলাই ২০২৪

আমরা পূর্বঘোষণা অনুযায়ী ক্যাম্পাসের এক ১নং গেটে বর্তমান আবু সাঈদ গেট জড়ো হওয়ার কথা কিন্তু ক্যাম্পাসের ছাত্রলীগ গতকাল আমাদের সাথে সুবিধা করতে না পারায় ১৫ জুলাই আমাদের সমাবেশের আগেই জেলা মহানগর থেকে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী ও ভাড়াটে টোকাই দিয়ে সমাবেশ স্থলে আগেই অবস্থান নেয়। আমরা খণ্ড খণ্ড আকারে জড়ো হতে থাকলে ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্রসহ আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং উচ্চস্বরে গালাগালি করতে থাকে।

১৬ জুলাই ২০২৪

১৪ জুলাই থেকে শিক্ষা নিয়ে ১৬ জুলাই এর প্রোগ্রাম টেকনিক্যালি ডাকা হয়। ১৬ তারিখে এক এক করে জড়ো হতে থাকি দুপুর নাগাদ ১নং গেট পরিপূর্ণ হতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সাথে শহরের দিক থেকে বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরাও মিছিল নিয়ে এসে ১নং গেটে একত্রিত হয়ে মডার্নের দিকে যাওয়ার জন্য। ক্যাম্পাস গেটে বিপুল সংখ্যক পুলিশকে দেখতে পাই এবং আমরা খবর পাই হলের শিক্ষার্থীদের মিছিলের আসার জন্য বের হতে দিচ্ছে না। তখন আমরা পুলিশকে ক্যাম্পাসের ঢুকতে দিতে বলি, আমরা বলেছি আমাদের ক্যাম্পাসে আমরা ঢুকব আমাদের সহযোদ্ধাদের নিয়ে আসব, পুলিশ বাধা দেওয়ার কে? পুলিশ আমাদের কথা না শুনে হঠাৎ করেই লাঠিচার্জ ও টিয়ারসেল গ্যাস নিক্ষেপ করা শুরু করে। আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে আবু সাঈদ বীরের মতো সেখানে থেকেই আমাদের আবার একত্রিত হওয়ার জন্য ডাকে। সাঈদকে একা পেয়ে পুলিশ তাদের হাতে থাকা অস্ত্র লাঠি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। যার ফলে তার মাথার পিছনে গভীর ক্ষতির সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে রক্ত করতে দেখে এবং বারবার একেবারে সামনে যাইতে দেখে হাত ধরে টেনে নিয়ে আসতে চাই সাঈদকে বলি বেশি সামনে এগিয়ে যাস না, গুলি করবে। সে বলে আমায় গুলি করবে না আমার কিছু হবে না, এ কথা বলেই সে তার হাত ছাড়িয়ে দেয়। এর ঠিক ১৫-২০ সেকেন্ড পরেই সাঈদ গুলিবিদ্ধ হয়। এখন শুধু বারবার এটাই মনে হয়, সেদিন যদি আবু সাঈদকে টেনে নিয়ে আসতে পারতাম, তাহলে তাকে হারাইতাম না। আবু সাঈদ কখনো ভাবতেই পারেনি তাকে তার ক্যাম্পাসের ভিতর থেকে গুলি করবে। ছাত্রলীগের সাথে

---

* শিক্ষার্থী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

আমাদের বারবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ধাওয়া করবে। পুলিশ যখন আবু সাইদের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হয়, তখন তারা ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। পুলিশ চলে যাওয়ার পর ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসের পিছন দিয়ে পালিয়ে যায়। সন্ধ্যায় বিজিবি নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে চাইলে আমরা বাধা দিয়ে বলি, আমাদের ক্যাম্পাস আমরা পাহারা দিব আপনাদের কারো প্রতি আর আমাদের আস্থা নেই । সেদিন প্রোগ্রামের শেষে ১নং গেটকে শহিদ আবু সাঈদ গেট ঘোষণা করা হয়।

১৭ জুলাই ২০২৪

আমরা গতকাল পুলিশ আমাদের ভাইয়ের লাশ নিয়ে যাওয়ার পর থেকে চেয়ে আসতেছি ক্যাম্পাসে জানাজা হওয়ার পর লাশ বাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু পুলিশ কাউকে না জানিয়ে গোপনে লাশ সাঈদের বাড়িতে নিয়ে যায়। ১৬ তারিখ রাতেই ১৭ তারিখ আমরা ক্যাম্পাসের গায়েবানা জানাজা পড়ি। জানাজা শেষে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করি এবং ১নং গেটে আবু সাঈদ গেট নামকরণে ব্যানার টানানো হয়। ১৬ তারিখ রাতে এবং ১৭ তারিখে অধিকাংশ শিক্ষার্থী হল বন্ধ হয়ে গেলে কেউ ভয়ে, কেউ আতঙ্কে, কেউবা পারিবারিক চাপে বাসায় চলে যায়। আমরা গুটিকয়েক শিক্ষার্থী রংপুরে থেকে যাই

১৮ জুলাই ২০২৪

সারাদেশে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। পুরো বাংলাদেশ তখন এই আন্দোলনে পুরোপুরি সমর্থন দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। আমরা যে কয়জন শিক্ষার্থী থেকে যাই তারা রংপুরে সাধারণ জনগণের সহযোগিতায় শাটডাউন কর্মসূচি পালন করি। এদিন তাজাহাট থানা পুলিশ আমাদের ওপর রাবার বুলেট, টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে, পুলিশের গুলিতে সেদিন অটোচালক মানিক ভাই শহিদ হন। উত্তেজিত জনতা থানায় আগুন ধরিয়ে দেয়, সর্বস্তরের জনগণ কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে দোকানপাট স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ রাখে। ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার রাতে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় আন্দোলনকে দমানোর জন্য।

১৯ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই

ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় কোনো কর্মসূচি বাস্তব আইন সম্ভব হয়নি, তবে ১৯ তারিখ রংপুর সিটি বাজারের মোড়ে পুলিশের সাথে স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। সেদিন সাজ্জাদ ভাই, মিরাজ ভাই, মিলন ভাই, আব্দুল্লাহ আল তাহির ভাই, সহ আরো অনেক কয়েকজন শহিদ হন। আবেদ আলী ভাইয়ের মতো অনেকে চোখে গুলিবিদ্ধঃ হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

২৪ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই

দেশের কয়েক জায়গায় ইন্টারনেট চালু হলেও রংপুরে ইন্টারনেট স্বাভাবিক হতে হতে ২৬/২৭ তারিখ লেগে যায়।

২৮ জুলাই থেকে ১ আগস্ট

২৮ জুলাই মোবাইল ইন্টারনেট সেবা চালু হওয়ার পর রংপুর স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আবু সাঈদের ক্যাম্পাসে আমরা সাঈদকে ভুলে গেছি কি না বেরোবিতে কি আন্দোলন শেষ? নেতৃত্ব দেওয়ার মত কি কেউ নেই? এরকম বিভিন্ন লেখালেখি করেছিল। তখন আমরা যে কয়জন বাড়ি যাইনি তারাই এগিয়ে আসি কয়েকজনের মধ্যে আমিও একদিন স্কুল কলেজের যারা লেখালেখি করতেছিল, তাদের সাথে যোগাযোগ করি, আন্দোলনকে

আবার সুসংগঠিত করি। যার সাথেই কথা বলি, সেই বলতেছিল ভাই আপনাদের মধ্য থেকে কেউ শুধু নেতৃত্ব দেন, আমরা প্রচুর শিক্ষার্থী জমায়েত করতে পারব। সাঈদ মারা যাওয়ার, আবার আন্দোলনকে একত্রিত করা যাচ্ছিল না আমাদের কয়েকজন শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করছিল বাকি আমরা কয়েকজন স্থানীয় শিক্ষার্থীদের সাথেই যোগাযোগ করছিলাম। কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে উঠতে না পারায় নিজেরাই সমন্বয়কদের একটা লিস্ট তৈরি করে প্রকাশ করি, যাতে রিনা মুর্মু, রহমত আলী ভাই এবং আমি– এই তিনজনকে করা হয়, তাতে সবাই একটা গোছালো সুশৃঙ্খল কর্মসূচি জানতে পারে ।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা আমাদের সাথে আন্দোলনে যুক্ত হয়, আমাদের নিরাপত্তায় যাতে বিঘ্ন না ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন আরো কয়েকজন সাঈদের শূন্যস্থান পূরণে ভূমিকা রেখেছিল । তাদের মধ্যে আশিক ভাই, সাবিনা ইয়াসমিন আপু, আকিব ভাই, সাবিনা আক্তার, রাজ, খোকন, জান্নাত সৃষ্টি সহ আরো অনেকে তারা আমাদের সাহস কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গুলোর কারোর মধ্য কোনো ক্লান্তি নেই গলা ফাটিয়ে সবাই স্লোগান দিচ্ছে। খিদার কথা সবাই ভুলে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পুরো শহর পায়ে হেঁটে হেঁটে মিছিল করেছে।

২ আগস্ট ২০২৪

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষার্থী, স্থানীয় স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা সহ শুক্রবার জুমার আগ পর্যন্ত বৃষ্টির মধ্যে প্রোগ্রাম করি। একটা বিষয় লক্ষ্য করেছিলাম– পুলিশ ক্যাম্পাস এর কাছে বাধা না দিলেও শহরের দিক থেকে শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস যেন না আসতে পারে সেজন্য শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে তল্লাশি করে তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছিল তাই ২ তারিখ প্রোগ্রাম শেষে স্থানীয় যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাদের সাথে আলোচনা করি।

৩ আগস্ট ২০২৪

২ আগস্ট রাতে মিটিং করে সিদ্ধান্ত হয় নয় দফা দাবিতে সমাবেশ ও পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করা হবে প্রেসক্লাব থেকে পর্যাপ্তর অভিমুখে। তখন ওই সময়ে কয়েকজনের ভূমিকা ছিল অপরিসীম তাদের মধ্য ইমরান ভাই, মাহির, অহন, নাহিদ, মোতাওয়াকিল ভাই, আয়ান, মাসুদ, সাজু ভাই, মেহেদী ভাই, মেডিকেলের পাঠান ভাইসহ আরো অনেকে এরকম আরো অনেকে বীরের ভূমিকা পালন করেছে। আমরা ৩ তারিখ সকাল থেকে বৃষ্টি উপেক্ষা করে আমরা প্রোগ্রাম চালিয়ে যাই, মেয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল আমাদের ধারণার অনেক বেশি।

৪ আগস্ট ২০২৪

৪ আগস্ট খুনি হাসিনার পদত্যাগের এক দফা দাবিতে সারা দেশের মতো রংপুরে অসহযোগ আন্দোলন পালন করা হয় লক্ষ জনতার ঢল নামে রাজপথে। হাসিনার গণহত্যা দেখে কেউ আর বাসায় বসে থাকতে পারেনি। ৪ আগস্ট আমরা টাউন হলে একত্রিত হই। নারী শিক্ষার্থীদের মাঝে দিয়ে চারপাশে ছেলে শিক্ষার্থী রেখে কয়টি স্তরের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়। কারণ ফ্যাসিস্ট এর দোসররা এক দফার কবর রচনা প্রতিজ্ঞা করে সেদিনও বৃষ্টি উপেক্ষা করে আমরা প্রোগ্রাম করে গেছি। লক্ষ মানুষের উপস্থিতি আমাদের বিজয়কে সুনিশ্চিতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।

৫ আগস্ট ২০২৪

পরশু নয় আগামীকালই ‘লং মার্চ টু ঢাকা’, এই কর্মসূচি ঘোষণা হয় রংপুর আলাদা করে কোন প্রোগ্রাম ডাকা হয়নি। সবাই তখন বিজয়ের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়েছিলাম। সাথে আবার সাময়িক শাসন জারি হওয়ার আশঙ্কাও কাজ করছিল। দুপুরে যখন বিজয় নিশ্চিত হয়ে যায় আমরা এক ঐতিহাসিক মহেন্দ্রক্ষনের সাক্ষী হয়ে গেলাম সবাইকে বিজয় মিছিল করার জন্য টাউন হলে জড়ো হতে আহ্বান করি। কেউ মনে হয় সেদিন বাসায় বসে থাকেনি এ অনুভূতি আমি লিখে প্রকাশ করতে পারব না। শুধু বলতে পারি, আমরা ২য় স্বাধীনতা অর্জন করেছি, বাংলাদেশের মাটি থেকে এক স্বৈরশাসকের পতন ঘটেছে, আমরা স্বাধীন।

আমার চোখে জুলাই

জাহিদ হাসান জয়*

আমি জাহিদ হাসান জয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানবিভাগে অধ্যয়ন করছি। আমি জুলাই বিপ্লবে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সমন্বয়ক এবং আবু সাইদের সহযোদ্ধা।

আমার চোখে জুলাই বিপ্লব

৩ জুলাই

কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত ক্যাম্পাসেই পদযাত্রা ও সমাবেশ করা হয়। সর্বপ্রথম ৩ জুলাই আমরা ক্যাম্পাসের বাইরে মডার্ন মোড়ে অবরোধ করি। সেদিন বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সকল সংগঠন এবং ডিপার্টমেন্টে প্রতিনিধি নিয়ে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সকল ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে বড় সমাবেশ করার। এদিন ব্যানার, মাইক ও রিকশা ভাড়ার জন্য কিছু চাঁদাও সংগ্রহ করা হয়, যা আমার ওপর দায়িত্ব ছিল।

এদিন ২০২৪ এর মহা বীর শহিদ আবু সাঈদ ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। আর একটি কথা বলে রাখি আন্দোলন সফল করতে আমাদের এ রকম অনেক মিটিং করতে হয়েছে ছাত্রলীগ, পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার চোখের আড়ালে।

৪ জুলাই

এতদিন বিশ্ববিদ্যালয় সেন্ট্রাল লাইব্রেরি থেকে মিছিল বের হতো। কিন্তু ৪ তারিখে লাইব্রেরির ছাত্রদের জোর করে মিছিলে আনার মিথ্যা অভিযোগে ছাত্রলীগ সভাপতি পোমেল বড়ুয়া সমাবেশে বাধা প্রদান করে। সবশেষে আমরা মুক্তমঞ্চ (পূর্বের বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল) থেকে মিছিল বের করি দেবদারু রোড হয়ে প্রধান ফটকে শেষ করি।

সেদিন মিছিলে স্লোগান ধরি আমি। যা আবু সাঈদ ভাইসহ সবার অনেক পছন্দ হয়। সেদিনের পর থেকে সব মিছিলে আমাকেই স্লোগান দেওয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়।

নিত্য নতুন স্লোগানে আন্দোলনকারীদের মাতিয়ে রাখাতাম। যা দেখে অনেকে স্লোগান মাস্টার নামে অভিহিত করে আমায়।

সর্বপ্রথম পূর্বের দিনগুলোর চেয়ে সবচেয়ে বড় গণজমায়েত হয়। আমরা মডার্ন মোড় ২ ঘণ্টার জন্য অবরোধ করি। সেখানেও পোমেল বড়ুয়া বাধা দিতে যায়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ভুয়া ভুয়া স্লোগান আর তোপের মুখে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। এদিনের পর থেকে ছাত্রলীগ, পুলিশবাহিনী, এবং গোয়েন্দা সংস্থার পুরোপরি নজরদারিতে পড়ে যাই আমরা নেতৃত্বদানকারীরা।

৮ জুলাই

সারা দেশব্যাপী বাংলা ব্লকেডের কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে পদযাত্রা করে মডার্ন মোড় কয়েক ঘণ্টার জন্য অবরোধ করি। এদিন সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো গান, কবিতা, মুকাভিনয়ে শিক্ষার্থীদের মনোবল বাড়ায়।

১২ জুলাই

---

* শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

সমাবেশের পূর্বনির্ধারিত সময় ছিল ৩:০০টা। কিন্তু ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন থেকে বের হতে নিষেধ করে। এদিন সাঈদ ভাইসহ আরও অন্যান্যরা যুক্তিতর্ক করেন ক্যাম্পাস থেকে মিছিল বের করার জন্য।

সবশেষে মিছিল বের করতে চাইলে দেবদারু রোডে ছাত্রলীগ বাধা দেয় এবং ধাক্কাধাক্কি হয়। এ সময় ছাত্রলীগের সভাপতি আমার ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, এটা সাঈদ ভাই বাধা প্রদান করলে আমিসহ সাঈদ ভাই পিটুনি খাই ছাত্রলীগের হাতে।

১২ তারিখ রাতে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আমাকে হুমকি দেন, তোকে যেন স্লোগান এবং মিছিলে না দেখি। এবং সাঈদ ভাই এবং আমাকে শিবির ট্যাগ দিয়ে মামলা দেওয়ারও হুমকি দেয়।

১০ জুলাই

ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের নিয়ে ক্যাম্পাসে শোডাউন করে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমরা কর্মসূচি স্থগিত করি। বিভিন্ন কারণে দু-একটি মিটিংয়ে থাকতে পারিনি। এদিন আবু সাঈদ চত্বর (পার্ক মোড়) মসজিদে নামাজের পর সাঈদ ভাই বলে ছিল, 'জয় তোমাকে ইদানীং মিটিং দেখছি না, ভয় পাইছো নাকি, ভয় পাওয়া যাবে না, আমাদের লড়তে হবে।' এই কথাটাই ছিল আমার সবথেকে অনুপ্রেরণা।

১৩ জুলাই

আমরা সাঈদ ভাইসহ সামরা ও রংপুর জেলার ডিসিকে স্মারকলিপি দেই রাষ্ট্রপতি বরাবর কোটা সংস্কারের জন্য।

১৬ জুলাই

এদিন কৌশলগত কারণে সময়সূচি গোপন রাখা হয়। প্রোগ্রামের ৩০ মিনিট আগে জানিয়ে দেওয়া হয়। সেদিন রংপুরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমাদের সাথে যোগ দেয়। ছাত্রলীগ অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে মহড়া দেয়। তাই আমরা খামার মোড়ে সংগঠিত হয়ে ক্যাম্পাস অভিমুখে যাত্রা করি। ১ নং গেটে এসে পুলিশ ক্যাম্পাসে ঢুকতে বাধা দেয় এবং বাকবিতাণ্ডা হয়।

বাধা দেওয়ার একপর্যায়ে কোনো প্রকার পূর্বশর্ত ছাড়াই টিয়ারশেল, রাবার বুলেট ছুড়তে থাকে। আর তখনই সাঈদ ভাই দুহাত উঁচু করে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং পুলিশ গুলি করে। তারপর পুলিশ ছাত্রলীগের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে আমাদের। এরই মাঝে শুনতে পারি সাঈদ ভাই শহিদ হয়েছেন। আমি আল্লাহর করে দোয়া করি এই খবর যেন মিথ্যা হয়। তারপরে আবার খবর আসে সত্যিই সাঈদ শহিদ হয়েছেন।

১৭ জুলাই

নানা হুমকি থাকা সত্ত্বেও সাঈদ ভাইয়ের গায়েবানা জানাজা নামাজ আদায় করি ক্যাম্পাসে, তারপর বিক্ষোভ মিছিল হয়। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে পার্ক মোড়ে সাঈদ চত্বর এবং ১নং গেটকে শহিদ সাঈদ আবু তোরণ ঘোষণা করা হয়।

স্বাধীনতা সম্প্রীতি ও ন্যায়ের জন্য জুলাই বিপ্লব: একটি আন্দোলনের দিনলিপি:

ইয়ামিন*

জুলাই বিপ্লবের প্রতিটি দিন ছিল আমাদের জন্য ছিল একেকটি ভয়ংকর, ট্র্যাজিক সময় একই সাথে আমাদের জীবনের সেরা সাফল্য মণ্ডিত সময়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । আমরা বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের পক্ষে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজপথে নেমেছিলাম।

১ জুলাই থেকেই আমাদের বলিষ্ঠ উপস্থিতি ছিল বৈষম্যের কোটার বিরুদ্ধে। আমরা দাবি তুলেছিলাম একটি বৈষম্য বিরোধী, ন্যায়ভিত্তিক, সম্প্রীতিমূলক বাংলাদেশের জন্য। কিন্তু আমাদের এই যৌক্তিক আন্দোলন আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও প্রশাসনের দমন-পীড়নের মুখে পড়ে। আমি ছাত্রদলের নেতা ইয়ামিন বহু বার ছাত্রলীগ আওয়ামী প্রসাশনের নির্যাতের শিকার হয়েছি। ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতন চেয়েছি। আমরা জানি হাসিনা ক্ষমতায় থাকা মানে বৈষম্য রাষ্ট্র কাঠামো থাকা। শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে আমরা আন্দোলনে সমন্বয় চেষ্টা করি। আমরা সুশৃঙ্খলভাবে বৈষম্য কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাই।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মর্ডান মোড়ে বাংলা ব্লকের কর্মসূচি পালন করতে যাওয়ার সময় ছাত্রলীগের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ১১ জুলাই, ছাত্রলীগের সভাপতি ও সেক্রেটারির নেতৃত্বে আমার বন্ধু আবু সাঈদের ওপর হামলা চালানো হয়।

সেই রাতে আবু সাঈদের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। সে বলেছিল-"অন্যায়ের পক্ষে ১০০ বছর বাঁচার চেয়ে, ন্যায়ের পক্ষে একদিন বাঁচা শ্রেয়।" সেই রাত থেকেই আমরা, বিপ্লবী শিক্ষার্থী ও ছাত্রদল শপথ নিই। এই সন্ত্রাসী সংগঠনকে শুধু ক্যাম্পাস নয়, পুরো বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করব।

এরপর শুরু হয় দমন-পীড়নের ভয়ংকর অধ্যায়। ১৫ জুলাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীদের ওপর চালানো হয় ন্যাক্কারজনক হামলা।

সারা বাংলার নিপিড়িত নিষ্পেষিত ছাত্র জনতার সুপার হিরো বন্ধু আবু সাঈদ ফ্যাসিবাদী সিস্টেমের বিরুদ্ধে দুই হাত প্রসারিত হয়ে দেওয়াল হয়ে দাঁড়ায় ফ্যাসিবাদী আওয়ামী প্রসাশান তার বুকে গুলি করে হত্যা করে কিন্তু তার বিপ্লবী চেতনাকে হত্যা করতে পারেনি। আবু সাঈদের বিপ্লবী চেতনা ছড়িয়ে পড়ে ছাত্র জনতার মাঝে।

ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সংগ্রামী নেতা বীর চট্টলার গর্ব, ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ওয়াসিম ভাইসহ ৮ জন শহিদ হন।

আমরা চেয়েছিলাম আবু সাঈদের জানাজার নামাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বো কিন্তু ফ্যাসিবাদী পুলিশ পড়তে দেয়নি। আবু সাঈদের বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিবার বাবা-মা, ভাই বোন বিধ্বস্ত, হাহাকার চিৎকারে ফেটে পড়ে।

১৬ জুলাই, পুরো দেশ ও জাতি বিধ্বস্ত শোকাহত হয়।

---

*শিক্ষার্থী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

বন্ধু আবু সাঈদ যেখানে অন্যায় সেখানে প্রতিবাদ করতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষ থেকেই দেশ রাষ্ট্র রাজনীতি নিয়ে অনেক আলাপ হয়েছে। ওর সাথে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ রুক্ষে দেওয়া নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। ছাত্রলীগ একবার আমাদের ছাত্রদলের উপর আক্রমন করে, আমার শরীরে ১০ টা ক্ষত হয় সাঈদ দেখা করে বলে এই পশুদের পতন সন্নিকটে এই লড়াই তোর জন্য গর্বের অনেক বড় কিছু করবি তুই।

বন্ধু আবু সাঈদ বিস্ময় এক বালক ওর কাছ থেকে আমি অনেক উৎসাহ অনুপ্রেরণা পেয়েছি।

বন্ধুকে হারিয়ে আমি খুব ডেস্পারেট হয়ে যাই। সারারাত জেগে ভাবি কী করবো কী হবে আল্লাহ্‌র কাছে কাঁন্না করি আল্লাহ্‌ তুমি এই জালিম আওয়ামী ফ্যাসিস্ট খুনী হাসিনা থেকে দেশকে রক্ষা করো।

পরদিন ১৭ জুলাই সকালে আমরা আবু সাঈদের গায়েবানা জানাজা পরি, পুলিশের বাঁধা উপেক্ষা করে আবু সাঈদ গেইট উদ্ভোধন করি।

আমরা শপথ নেই এই ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ কে শুধু বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নয়, সারা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করে ওদের বাপের বাড়ি ভারত পাঠিয়ে দিবো।

রাতে তারেক রহমানের ভাষণ শুনি "বিপ্লবী ছাত্র জনতা আপনারা সবাই রাজপথে আসুন বাংলাদেশ কে এই ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ থেকে রক্ষা করুন, বাংলাদেশ যাবে কোন পথে ফয়সালা হবে রাজপথে"

আমরা অনেক আগেই বুঝতে পারি এই ফ্যাসিস্ট পতন ছাড়া দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে ১৮ তারিখ কমপ্লিট শাটডাউনে শাহরিয়ার, আমি ইয়ামিন ও মাইদুল ভাই কে সাথে নিয়ে আমরা খুনী হাসিনার পতনের দাবী তুলি। শুরু হয় আমার উপর গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশি তল্লাশি তান্ডব ।

রাতে পরিকল্পনা করতাম ঘুম হতো না। যখন সকালে রাজপথে আন্দোলন আসতাম তখন সবাই প্রস্তুত শুধু অপেক্ষায় থাকতো একটা মিছিলের তখন সবাই রাজপথে তান্ডব সৃষ্টি করতাম।

১৯ তারিখ আমরা ছাত্রদল ও বিপ্লবী শিক্ষার্থী মিলে আবু সাঈদ চত্বর থেকে মিছিল শুরু করে মর্ডান মোড় হয়ে শহরে টাউন ও পৌর বাজারে দিকে যখন যাই তখন পুলিশ উদ্দেশ্য করে গুলি করে আমার বাম পায়ে গুলি লাগে আমি একটা গলিতে আশ্রয় নেই বন্ধুরা আমাকে নিয়ে আসে।

এরমধ্যে রাক্ষসী রানী হাসিনা কোটা সংস্কার নিয়ে ছাত্রদের সাথে বসতে চায়। আমরা বলি আবু সাঈদ ওয়াসিমদের জীবন ফিরিয়ে দিতে, ছাত্র ভাইদের হত্যাকারীর সাথে কীসের বৈঠক?

২০ তারিখ কারফিউ দেয় আমরা ছাত্রদল সাঈদ চত্বরে কারফিউ ভেঙে দেই, ওই রাতেই যৌথ বাহিনী অভিযান করে সর্দারপাড়া অপি ছাত্রাবাস থেকে বের হয়ে একটা গ্রামে মাইদুল ভাই, ছোট ভাই আতাউর ও আমি আশ্রয় নেই সারারাত কেটে যায়।

সবার সাথে কথা বলি তাদের মাঝে সংশয় কাজ করছে সবাই সবার সাহস জুগিয়ে সংকল্প করি "মরবো না হয় জিতবো"।

এর মাঝেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। ছাত্রদের বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়যন্ত্র তৈরি করে ছাত্রদের দেখা মাত্রই অ্যারেস্ট করতে বলে আমার ও ছাত্রদলের আহবায়ক আল-আমিন ভাইয়ের নামে মামলা দেয়। যেই পুলিশ আবু সাঈদকে হত্যা করেছে সেই পুলিশ মনুষ্যত্বহীন পশুর মতো, আবু সাঈদ হত্যার আসামি করে জুলাই আন্দোলনের নবম শ্রেণির ছাত্র মাহিমকে।

২৬শে জুলাই ঢাকায় যাই দাদার বাসায় তেজগাঁওয়ে। দাদা আমাকে বিপ্লবে উৎসাহ দেয় । বন্ধু ও ছাত্রদলের ভাইদের সাথে দেখা হলে আমাকে জড়িয়ে ধরে আবু সাঈদের বিপ্লবী আত্মার স্মরণ করে, যেই বন্ধু মানিক কোন তর্ক হলে ঝামেলা হলে কাঁন্না করে চুপ করে বাসায় চলে যেতো। সেই মানিক বলে বন্ধু আমি আবু সাঈদ কে দেখে বিপ্লবী শক্তি সাহস পেয়ে রাজপথে এসেছি। তেজগাঁও সংসদ ভবন ও ফার্মগেট এলাকায় আন্দোলন করি আমরা।

হঠাৎ সমন্বয়কদের তুলে নেওয়া হয় ডিবি অফিসে। অস্ত্রের মুখে আন্দোলন প্রত্যাহারে বাধ্য হয়, কিন্তু আমাদের ক্ষোভ আরও বাড়ে। ছাত্র ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিই। ফ্যাসিস্ট সরকার পতনের আগ পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

ঢাকায় ছাত্রদল নেতা জুয়েল ভাই, সাহস দাদা, আমান ভাই, নাসির ভাই ও আকতার ভাইয়ে সাথে পরিকল্পনা হয় খুনী হাসিনা সরকার পতনের।

৩ জুলাই, শহীদ মিনারে অসংখ্য ছাত্রদল নেতার উপস্থিতি আমাদের মনোবল বাড়িয়ে দেয়। নাহিদ ভাই সেখানে এক দফা ঘোষণায় বলেন ফ্যাসিবাদী হাসিনা কে পদত্যাগ করতে হবে।

৪ জুলাই, পুলিশ আমাদের সামনে দু'জন সহযোদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করে, আমি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যাই। ছাত্র জনতা আমরা সবাই মরতে প্রস্তুত জিততে মরিয়া।

পরদিন ৫ আগস্ট বাংলার আকাশে নতুন উজ্জ্বল সূর্য উঠেছে ছাত্র-জনতা সবাই মিলে গণভবন দখলে নিয়েছে। চোখে জল, মুখে হাসি। ফ্যাসিস্ট হাসিনা পালিয়ে গেছে। সংসদ ভবন ছাত্র জনতার দখলে।

জুলাই বিপ্লবী ২০২৪ এ শহীদ আবু সাঈদ, ওয়াসিম, মুগ্ধ সহ সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা নতুন বাংলাদেশের স্বাদ পেয়েছি। আমরা তাদের ভূলে যেতে পারি না। তাদের আত্মদানের কারণে দেশে ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিপ্লব সফল হয়েছে। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আহত ও শহীদ পরিবারগুলোর পাশে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই পরিবারগুলোর পাশে থাকব।"

বিচারের মাধ্যমে ফ্যাসিবিদদের সন্ত্রাসীদের কঠিন দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি চাই।

গণ-অভ্যুত্থানে সকল শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি ও সকল আহত ও পঙ্গুদের শরীরিক সুস্থ্যতা কামনা করি।

আমরা জীবন দিবো তবুও জুলাই দিবো না। বাংলাদেশে আর ফ্যাসিবাদীদের স্থান দিবো না।

জুলাই বিপ্লব ছিল আমাদের স্বাধীনতা, ন্যায় ও সম্প্রীতি রক্ষার আন্দোলন।

ফ্যাসিস্ট পতনে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষিত হয়েছে। সময় এখন সুখী সমৃদ্ধ সম্প্রীতি মূলক সোনার বাংলাদেশ গড়া। সবার আগে বাংলাদেশ।

ঢাকা: লড়াইয়ের দিনলিপি

মোঃ রিফাত হোসেন রাফি*

আমি ক্লান্ত। খুব ক্লান্ত। যেন কোনো অদৃশ্য, নামহীন শক্তি আমাকে অহর্নিশ নিংড়ে নিচ্ছে। রক্ত টগবগ করছে শরীরে। ভাবছি এই লাশের মিছিল কি কোনোদিন শেষ হবে না?

ঢাকা মেডিকেলে তখন শত শত লাশ পড়ে আছে। কারো কোনো পরিচয় নেই। সবাই বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে আছে। আমার ভাই সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে থাকত। একদিন তাকে ফোন করলাম "ওখানে কী অবস্থা?" ওপাশ থেকে ভেঙে পড়া কণ্ঠ এলো, "এত মানুষ মরছে, কোনো রেকর্ডই রাখা হচ্ছে না!"

আমি তখন পুরান ঢাকায় নানুর বাসায় উঠেছি। এর শেষ কোথায়? তা জানার এক অদম্য ইচ্ছা আমার ভেতরে। সে সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবাই ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, আকরাম এখনো আছে। আমার লক্ষ্য ছিল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্রিত হওয়া।

রাতের বেলা পরিকল্পনা হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের কাছে পৌঁছাতেই বন্ধু ইশারা করে ভিক্টোরিয়া পার্কে যেতে বলল। সে তখন আন্দোলনের সমন্বয়কের দায়িত্বে ছিল।

সব ঠিক হলো পরদিন একসঙ্গে বের হবো। দুপুরের তপ্ত রোদে রায়সাহেব বাজারের দিকে এগোতেই মিছিলের মধ্যে পড়লাম। আলোচনা করে ঠিক করলাম, রায়সাহেব বাজার পেরিয়ে ঢাবির দিকে যাব। কিন্তু পুলিশের বাধায় পড়তে হলো। কেউ কারও কথা শুনছিল না। বাধা ভেঙে তাঁতিবাজার হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওনা দিলাম।

কিন্তু ঢাবির গেটে পৌঁছাতেই বিপত্তি। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হলো। অনেক কষ্টে সেদিন আবার বাসায় ফিরলাম।

পরদিন প্রশাসন রাজু ভাস্কর্য এলাকা ঘিরে রাখল। ১৪৪ ধারা জারি হলো। শহিদ মিনারে গিয়েছিলাম, সেখানেই আবার আমাদের ওপর হামলা হলো। সারাদিন ধরে চলল সংঘর্ষ। মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ। রাতে মাগরিবের আজানের সাথেই বাসার দিকে রওনা দিলাম।

কিছুদিন পর পিলখানা রোডে আমরা অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ নিউ মার্কেটের দিক থেকে পুলিশের সাজোয়া গাড়ি এগিয়ে এলো। উপায় না দেখে ইডেন কলেজের দিকে ছুটলাম। তবু আমরা হাল ছাড়িনি। নিরস্ত্র হাতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

পলাশীর মোড় থেকেও গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল। একের পর এক সাউন্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণ। সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যেকোনো মূল্যে প্রবেশ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। চোখে কিছুই দেখছিলাম না।

---

*শিক্ষার্থী, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

হঠাৎ দুই পাশে ঘিরে ফেলল পুলিশ। উপায় না দেখে পাশের একটি কলোনিতে ঢুকে পড়লাম। কেউ মসজিদে আশ্রয় নিল, কেউ বুয়েটের ভেতর দিয়ে পালিয়ে গেল। আমরা কয়েকজন এক বিল্ডিংয়ের চারতলায় উঠে সিঁড়িতে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর ফ্যাসিস্টের পেটোয়া পুলিশ গেট ভেঙে ঢুকে মসজিদে আশ্রয় নেওয়া মানুষগুলোর ওপর এমন নির্যাতন চালাল যে, আমরা ওপরতলাতেও তাদের আর্তনাদ শুনতে পেলাম। কী হয়েছিল, আমরা জানি না। শুধু সেই আর্তচিৎকার আজও কানে বাজে। আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয়নি।

এক সময় পাশের এক ফ্ল্যাটের দরজা খুলে আমাদের ভেতরে একটু আশ্রয় দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তারা আমাদের একটি রুমে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে রাখল। টানা চার ঘণ্টা আমরা সেখানে বন্দি ছিলাম। নানা প্রশ্ন মাথায় তারাই আবার ধরিয়ে দিবে নাতো!! কিন্তু তারা আমাদের পাশে ছিল। তখন মনে হয়েছিল '৭১ এ হয়তো এভাবেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল এলাকাবাসী।

বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছিল নানা স্লোগান। তার কিছুক্ষণ পরই ভেসে আসছিল ছেলেদের কান্না। পাশে এক ছোট ভাই অসহায় গলায় বলল, "এরা ২৪-এর রাজাকার! নিজেদের ভাইদের পুলিশে ধরিয়ে দিচ্ছে!"

তখন আমি সবার কাছে প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম, "কোটাসংস্কার যদি সরকার মেনে নেয়, তাহলে কি আমরা সব মেনে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাব?"

সেই রুমে থাকা পনেরো জন একই সঙ্গে বলল "না! আগে আবু সাঈদসহ যারা শহিদ হয়েছেন, তাদের বিচার। তারপর রাজপথ ছাড়ব। নয়তো নয়।"

ঠিক সেই সময়ে কারও মোবাইলে মেসেজ এলো সরকার কোটাসংস্কারের দাবি মেনে নিয়েছে, সবাইকে বাসায় ফেরার অনুরোধ করা হচ্ছে। আমার বন্ধু মৃদু হাসল। তখন বুঝলাম, আমি যে শুরু থেকে ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতন চেয়েছিলাম, সেই চাওয়া এখন লাখো মানুষের চাওয়ায় পরিণত হয়েছে।

সেদিন থেকে যে স্পৃহা আমার মধ্যে জন্মেছিল, তা আর থামেনি। এই লড়াই চলছেই। আজ দেশ সত্যিকার অর্থেই স্বাধীন। আলহামদুলিল্লাহ।

গুলিতে নিস্তব্ধ তাজা প্রাণ

আসাদুজ্জামান আরমান*

দিনটি ছিল মঙ্গলবার। ১৬ জুলাই জানতে পারি যে, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সকাল দশটায় জিলা স্কুল মোড় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল মর্ডান মোড়ে রোড ব্যারিকেড দিবে। ঠিক দশটার মধ্যেই জিলা স্কুলের সামনে চলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখতে পাই পুলিশ সাধারণ কিছু শিক্ষার্থীদের জড়ো হতে বাধা দিচ্ছে। সেসব ফুটেজ নেওয়ার চেষ্টা করি। কিছুক্ষণ পর, মুহূর্তের মধ্যে পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা জড়ো হতে থাকে। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা জিলা স্কুলের সামনে রাস্তায় অবরোধ করে রাখার পর মিছিল বের করে মর্ডান মোড়ের দিকে এগোতে থাকে। পরবর্তীতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ক্যাপ্টেন ব্যাকোলজি অর্থাৎ পুলিশ লাইনের সামনে পৌঁছালে পুলিশ শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। এমন সময় পুলিশ শিক্ষার্থীদের লাঠিচার্জ ও গলা টিপিয়ে ধরে। এরপর বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের মিছিল প্রেসক্লাব পর্যন্ত পৌঁছানোর পর সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে। সমাবেশ শেষ না হতেই আরো বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও অভিভাবক একত্রিত হয়ে মিছিলটি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। মিছিলটি লালবাগ হয়ে যত এগিয়ে যায়, ততই শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে মিছিলটি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছালে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেট দিয়ে ভিতর ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয় এবং শিক্ষার্থীদের ওপরে লাঠিচার্জ শুরু করে। তারপর পুলিশের লাঠিচার্জ টিয়ার গ্যাসের কারণে আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীরা। এমন সময় কয়েকটি জায়গায় আবু সাঈদ একাধিকবার দুহাত প্রসারিত করে পুলিশকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। এমন সময় আবার শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেটে জড়ো হয় ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে।

পুলিশ ১নং গেটের সামনে থেকে টিয়ারসেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করতে থাকে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ভয়ে আতঙ্কে রাস্তার ওপর থেকে চলে যায়। তখন কালো টি-শার্ট ও কালো ট্রাউজার পরা এক যুবক দুহাত প্রসারিত করে বুক চিতিয়ে পুলিশের বুলেটের সামনে দুহাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে যায় আবুসাঈদ। দেখতে পেলাম আবু সাঈদ যখন দুহাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে, তখন একটি বুলেট লাগার পর আবু সাঈদ একটু পিছিয়ে যায়। যে পুলিশ গুলি করে, তাকে ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করার চেষ্টা করি। সেখানে পরপর আরো দুটি গুলি করে পুলিশ। গুলি করার পর আবারো আমি দেখানোর চেষ্টা করি আবু সাঈদকে। রাস্তার ডিভাইডার এর ওপারে গিয়ে কিছুক্ষণ তিনি বসে থাকেন, আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে রাস্তায় পড়ে যান। একজন সহপাঠী এসে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান। নিমেষেই গুলিতে নিস্তব্ধ হয়ে যায় আবু সাঈদের তাজা প্রাণ।

সে সময় আরো দু-তিনজন সহপাঠী এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় পার্কের মোড়ের দিকে। সে সময়ও টিয়ারশেল ধোঁয়ায় পার্কের মোড় এলাকায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেই দৃশ্যটিও দেখানোর চেষ্টা করেছি। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সভাপতি পোমেল বড়ুয়ার নেতৃত্বে ৬০ (ষাট) থেকে ৭০ (সত্তর) জন নেতাকর্মী ও পুলিশকে সাথে নিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর শুরু হয়, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ। পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনটা পাঁচ মিনিটে

---

*এনটিভির স্টাফ ক্যামেরাম্যান, রংপুর।

আবু সাঈদকে ভর্তি করার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। মৃত্যুর খবর আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কাছে আসলে আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে। একপর্যায়ে আওয়ামী লীগের অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনসহ ছাত্রলীগ ও পুলিশ পিছপা হতে বাধ্য হয়।

এনটিভি লাইভ এর হত্যার বিবরণী:

এনটিভির লাইভটি শুরু হয় বেলা ২:১৩ মিনিটে এবং প্রথম গুলিটি ২:১৭ মিনিটে আবু সাঈদ এর দেহে লাগার পর আবার দুটি গুলি করে দুজন পুলিশ। এরপর বেলা ২:১৯ মিনিটে লাইভটি শেষ হয়। আমার চোখের সামনে একটি তাজা প্রাণ নিমিষেই শেষ হয়ে যায়। আবু সাঈদের গুলি লাগার সময় নিয়ে অনেক ধূম্রজালের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসিটিভি'র ফুটেজে দেখা যায় গুলি লাগার সময় ২:৪৪ মিনিট। এ নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা সৃষ্টি হয়। এরপর এনটিভির প্রচারিত ভিডিওর সময় দেখে নিশ্চিত করা হয়, ২টা ১৭ মিনিটেই আবু সাঈদ এর দেহে গুলি লাগে।

ফটো সাংবাদিকের চোখে ১৬ জুলাই ’২৪

আদর রহমান*

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোটাসংস্কার আন্দোলনের শুরু থেকে খোঁজখবর রাখছিলাম। কারণ সেই সময় বিশেষ করে কোটা সংস্কার আন্দোলনে রংপুরের আন্দোলনের একমাত্র সূতিকাগার ছিল বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। তাই সবসময় যোগাযোগ রাখছিলাম বেগম রোকেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটাসংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক ও বেরোবির সাংবাদিকদের সাথে। কখন কোন সময় সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল বের হবে। আবার ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে কখন রংপুর-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করবে? তাদের প্রায় প্রতিটি বিক্ষোভ মিছিল বা সড়ক অবরোধ নিউজ ও ছবি কাভার করেছিলাম। কোটাসংস্কারের দাবিতে ০৬ জুলাই ২০২৪ প্রথম কাভার করেছিলাম। ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের পরিপত্র বহাল সাপেক্ষে কমিশন গঠন করে দ্রুততম সময়ে কোটাসংস্কারের দাবিতে তাদের পদযাত্রা, ছাত্র সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে শুরু হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের মডার্ন মোড়ে অবস্থান নেয় এবং প্রায় ঘণ্টাখানিক ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে ।

এর দুই দিন পরে তথা ৮ জুলাই আবারো ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে পরিপত্র বহাল ও কোটাসংস্কারের দাবিতে ক্যাম্পাসে পদযাত্রা ও ছাত্র সমাবেশ করে। সেই দিনও তারা ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে প্রায় ঘন্টাখানিক ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে ।

আবারো ১১ জুলাই ২০২৪ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা সকল গ্রেডে অযৌক্তিক বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে সংবিধানে উল্লেখিত অনগ্রসর গোষ্ঠীর জন্য কোটাকে ন্যূনতম মাত্রায় এনে সংসদে আইন পাশ করে কোটাসংস্কারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি দেয় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সামনে সকাল ১১টায়। সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সামনে সাধারণ শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে মিছিল বের করার জন্য চেষ্টা করছিল। কিন্তু পুলিশ ও ছাত্রলীগের বাধার কারণে তাদের অবস্থান কর্মসূচি প্রায় পণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় কোটাসংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক বর্তমানে শহিদ আবু সাঈদ ফাউন্ডেশনের সদস্য ও তৎকালীন আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী সমন্বয়ক শামসুর রহমান সুমনকে পাশে ডেকে নিয়ে বললাম মিডিয়া কাভারেজ চাইলে সকল বাঁধা উপেক্ষা করে বিক্ষোভ মিছিল বের করতে হবে। অবশেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করে মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে মডার্ন মোড়ের দিকে যেতে চাইলে ছাত্রলীগ ও প্রক্টরের বাধার কারণে মিছিলটি ক্যাম্পাস থেকে আর বের হতে পারে নাই। সেই বিক্ষোভ মিছিলে সেদিন ছাত্রলীগের হাতে মারধরের শিকার হয় আবু সাঈদ। আবারও ১৪ জুলাই সকল গ্রেডে অযৌক্তিক বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে সংবিধানে উল্লেখিত অনগ্রসর গোষ্ঠীর জন্য কোটাকে ন্যূনতম মাত্রায় এনে সংসদে আাইন পাশ করে কোটা সংস্কারের দাবীতে পদযাত্রা কর্মসূচী পালন করে শেষে রংপুর জেলাপ্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

---

* ফটো সাংবাদিক, কালের কণ্ঠ, রংপুর অফিস

আবারও ১৫ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেটে বেরোবির সাধারণ শিক্ষার্থীরা কোটাসংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয়। কিন্তু সেই দিন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাঁড়াতে দেয়নি বেরোবির শাখার ছাত্রলীগ, রংপুর মহানগর ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীরা। তাদের ধাওয়ার কারণে কোটাসংস্কার আন্দোলনে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করতে না পেরে আবারও পরদিন ১৬ জুলাই বেরোবির ১নং গেট বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীসহ রংপুরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। তারা সকাল ১১টায় রংপুর জিলা স্কুলের সামনে সবাই জড়ো হয়ে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেটের সামনে বিক্ষোভ করবে।

১৬ জুলাই ২০২৪ সকাল ১০টা দৈনিক কালের কণ্ঠ অফিসে বসে দৈনিক পত্রিকাগুলো দেখছি। অফিসে চা খেয়ে বের হবো। বের হয়ে যেতে হবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১নং গেটে। কারণ বেরোবির গেটে সাধারণ শিক্ষার্থীরা কোটাসংস্কারের জন্য বিক্ষোভ করবে ক্যাম্পাসের ভিতরে। এতে যোগ দিবে রংপুর নগরীর সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। দুপুর ১টার দিকে অফিস থেকে বের হয়ে মোটরবাইকে রওনা হলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে। সাথে রয়েছে দৈনিক যুগান্তরের রংপুরের অফিসের ফটো সাংবাদিক উদয় চন্দ্র বর্মন। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌঁছে মোটরবাইকটি ক্যাম্পাসে ভিতরে রেখে অবস্থান নিলাম বেরোবির ১নং গেটে। কিছুক্ষণ পরে শহর থেকে আসা সাধারণ শিক্ষার্থীদের মিছিলটির সাথে যোগ দিয়ে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ১নং গেটের সামনে স্লোগান সহ বিক্ষোভ শুরু করে ক্যাম্পাসে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করে। মিছিল আসার আগে ১নং গেটের সামনে পুলিশের সর্তক অবস্থান ছিল। তখন দুপুর ২.০৯ মিনিট। প্রথমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে পুলিশের বাকবিতণ্ডা চলতে থাকে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা পুলিশকে ইট-পাটকেল ছুড়ঁতে থাকে। সেই ইট আমার বাম হাতে লাগলে আমি সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হই। এক পর্যায়ে পুলিশ সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠি চার্জ শুরু করে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। মুখোমুখি পুলিশ ও সাধারণ শিক্ষার্থী। শুরু হয় পুলিশ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। পুলিশ রাবার বুলেট, টিয়ারসেল মারতে থাকে। দুপুর ২.১৬ মিনিটে আবু সাঈদকে বেধড়ক পেটাতে থাকে পুলিশ। চারজন পুলিশ মিনিট খানেক ধরে পেঠাতে থাকে আবু সাঈদকে। একই পর্যায়ে আবু সাঈদের মাথা থেকে রক্ত বের হতে দেখা যায়। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১নং গেট রণক্ষেত্র পরিণিত হয়। সাধারণ শিক্ষার্থীদের দমাতে পুলিশের সাথে ছাত্রলীগ, যুবলীগ এমনকি বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীরা যোগ দেয়। সংঘর্ষের একপর্যায়ে আবু সাঈদ ২.১৯ মিনিটে পুলিশের সামনে বুক পেতে দেয়। পুলিশ তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে, ছররা গুলি তার বুকে লাগার পর আবু সাঈদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আবু সাঈদের সহপাঠীরা সাথে সাথে আবু সাঈদকে রংপুর মেডিকেল হাসপাতাল নিয়ে যায়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করে। এদিকে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ পার্কের মোড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। কোটাসংস্কার আন্দোলনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে সাধারণ জনতা যোগ দেয়। আবু সাঈদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায়। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেট ভেঙে ঢুকে পড়ে ক্যাম্পাসের ভিতরে। বিকাল ৪.৩৬ মিনিটে বিক্ষুব্ধরা শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে একটি কার ও কয়েকটি মোটরসাইকেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর পরে আবারো বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাড়ি অবরুদ্ধ করে নিচে রাখা একটি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া সহ বাড়ি ভাংচুর করে। পরে পুলিশ র‍্যাব এসে ভিসির

বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েজন শিক্ষক ও ভিসিকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়।

লেন্সের রক্তঋণ

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিক*

আমার ফোনের ক্যামেরাটা সেদিন শুধু ছবি তুলছিল না, ওটা যেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সাক্ষী লিখছিল। ১৬ই জুলাইয়ের সকালটা ছিল মেঘ আর রোদের খেলার মতো। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ রংপুরের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়েছিল বৈষম্যের অবসানের দাবিতে রাজপথে। আমি ক্যাম্পাসের সাংবাদিক, হাতে জীর্ণশীর্ণ ফোনের ক্যামেরা, বুকে সত্য প্রকাশের স্বপ্ন।

সাংবাদিক হওয়ার সুবাদে আন্দোলনটা দেখেছিলাম খুব কাছ থেকে। আবু সাঈদ ছিল সেই আন্দোলনের প্রাণভোমরা। তার সহযোগী হিসেবে শুরু থেকেই দেখে আসতেছিলাম জাহিদ, সুমন, সোহাগ ও হেলালসহ আর নাম না জানা অনেককেই। আবু সাঈদ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এর ইংরেজি বিভাগের ছাত্র হলেও এই আন্দোলন ছিল অধিকার আদায়ের ও কোটা বৈষম্য দূরীকরণের আন্দোলন। আবু সাঈদ ও আমি উভয়ে ১২ ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলাম। সেই সুবাদে আমরা বন্ধু। ওর চোখেমুখে ছিল সরলতা আর দৃঢ়তার এক অদ্ভুত মিশ্রণ। লাইভ করার ফাঁকে আন্দোলনকারীদের সাথে সাথে কথাও হয়েছিল। হেসে বলেছিলাম, "ভাই, শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে আন্দোলন চলবে তো নাকি"

কে জানত, 'শেষ পর্যন্ত' কথাটার মানে এতটা নির্মম হতে পারে!

দুপুরের পর থেকেই পুলিশ আর তাদের সাথে থাকা মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে অবস্থান নেয়। আর শিক্ষার্থীরা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট থেকে শুরু করে ১ নম্বর গেট পর্যন্ত। অপর প্রান্তে মর্ডান মোড় থেকে ক্যাডেট কলেজের গেট অব্দি। একটু পরপর শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে চলছে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। একবার শিক্ষার্থীরা গেট খুলে ভিতরে প্রবেশ করতে লাগতেছিল। ঠিক সেই সময় পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট ছুড়তে লাগলো। একই সাথে তাদের সাথে থাকা সন্ত্রাসীরা ইট-পাটকেল মারতে শুরু করে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে। অপর প্রান্ত থেকে আন্দোলনকারীরাও পাল্টা ইট, পাটকেল ছুটতে থাকে। হঠাৎ একটি ইটের টুকরা এসে লাগে একজন পুলিশ কর্মীর মুখে। ফলে পুলিশের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করে তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকজন পুলিশ কর্মী তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেলের দিকে নিয়ে যায়। বাকি পুলিশ সদস্যরা টিয়ার গ্যাস সাউন্ড গ্রেনেড এবং রাবার বুলেট ছুড়তে লাগল অবিরাম।

মুহূর্তের মধ্যেই থমথমে পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কখন কী ঘটবে বলা মুশকিল। ছাত্রনেতাদের চোখে ছিল হিংসা, ক্ষোভ, আর হাতে দেশীয় অস্ত্র। আমরা তবুও ফোনের লেন্স খুলে রেখেছিলাম। হঠাৎ কয়েকজন সাংবাদিক টিয়ার গ্যাস খেয়ে কোনো দিশা না পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতর দিকে এসে চোখে পানি ঝাপটাতে লাগল। শিক্ষার্থীরা তখনও স্লোগান দিয়ে যাচ্ছিল, ভেবেছিলাম তাদের কণ্ঠস্বর বুলেটকে থামিয়ে দেবে।

কিন্তু বুলেট থামেনি।

---

*সাংবাদিক ও সাবেক শিক্ষার্থী, লোকপ্রশাসন বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

হঠাৎ করেই চারদিক রণক্ষেত্রে পরিণত হলো। টিয়ারগ্যাসের ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে, কানে তালা লেগে যাচ্ছে সাউন্ড গ্রেনেডের শব্দে। আমি কোনোমতে একটা পিলারের আড়ালে দাঁড়িয়ে লাইভ ফিড চালু রেখেছিলাম। আমার লেন্স খুঁজছিল আন্দোলনের মুখগুলো, কিন্তু পাচ্ছিল শুধু আতঙ্ক আর ছোটাছুটি।

এর মধ্যেই সেই চিৎকারটা কানে এলো- "গুলি লাগছে!"

আমার হাত থেকে ফোনটা প্রায় পড়েই গিয়েছিল। দৌড়ে গেলাম ভিড়ের দিকে। শত চেষ্টা করেও এক নম্বর গেট অতিক্রম করতে পারিনি। বাকি সংবাদ কর্মীরা গেটের বাইরে থাকলেও আমি থেকে গেলাম ভিতরে। কাছে যেতে পারিনি তাদের। পরে যা শুনলাম, তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। বন্ধু সাঈদ আর আমাদের মাঝে নেই। সহযোদ্ধারা ওর লাশের ট্রলি নিয়ে আন্দোলন করতে করতে ক্যাম্পাসের অভিমুখে আসার চেষ্টা করছে তাদের চোখে জল আর অসহায়ত্ব আর মনের তীব্র জ্বালা নিয়ে তারা সম্মুখে অগ্রসরমান।

আমার সাংবাদিক বিবেক দায়িত্ব দিয়ে আমাকে বলছিল, আজকে এখানে যা হচ্ছে "রেকর্ড কর। এটা প্রমাণস্বরূপ।" কিন্তু আমার ভেতরের মানুষটা চিৎকার করে বলছিল, "ফোন ফেলে দে, গিয়ে ধর ওকে।" আমি কাঁপতে থাকা হাতেই জুম করার চেষ্টা করলাম আন্দোলনের কিছু ফুটেজ সংগ্রহ ও ভিডিও ধারণ করার। ফোনের স্টোরেজ কম থাকায় বেশি ফুটেজ নিতে পারিনি। পরক্ষণে আমার মন বলে উঠল সাঈদ ওর চোখ দুটো দিয়ে যেন কিছু বলতে চাইছে। হয়তো আমাদের জিজ্ঞেস করছিল, "আমার অপরাধ কী ছিল?"

ওর মৃত্যুর খবরটা যখন নিশ্চিত হলো, তখন মনে হলো, আমার এই দায়িত্ববোধ ও ফোনটা একটা অভিশাপ। এই যন্ত্র দিয়ে আমি আমার ভাইয়ের মৃত্যুর খবরের প্রচার করতেছি।

সেই পড়ন্ত দুপুরে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা যখন ভিসি বাংলো ও বঙ্গবন্ধু হলের দিকে এগোচ্ছিল, তখন তাদের চোখেমুখে আমি সাঈদের শেষ দৃষ্টির প্রতিচ্ছবি দেখছিলাম। সেই আগুন ছিল সম্মিলিত ক্ষোভের আগুন। আমি সেই আগুনের ছবি তুলছিলাম আর ভাবছিলাম, সাঈদের রক্ত বৃথা যাবে না। ওর রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে এক নতুন অভ্যুত্থানের প্রথম অধ্যায়। আমার ফোন ক্যামেরায় ধারণ করা প্রতিটি ফ্রেম এখন আর শুধু ছবি নয়, সেগুলো একেকটা রক্তাক্ত দলিল ও আমাদের প্রজন্মের অভিযোগনামা।

সারাদিন কিছু খাইনি। দুপুর তিনটার দিকে আসলাম হলের ক্যান্টিনে একটা ডিম আর কিছু ভাত নিয়ে খেতে বসেছি। ঠিক এমন সময় আন্দোলনকারীরা হলের নিচতলায় এসে আগুন দিল। আগুন মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল নিচতলার অনেকটা জায়গাজুড়ে আগুনের তীব্রতার কারণে কেউ বের হতে পারতেছিল না। একই সাথে ভিতরেও আসতে পারতেছিল না। এদিকে চলছিল হল মেরামতের কাজ। অনেক শিক্ষার্থী আতঙ্কিত হয়ে রিডিং রুমের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়। অনেকে ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। ঠিক সেই সময়ে বড় ভাই আলামিন, বন্ধু রাজু ও ছোট ভাই শিবলুকে আমার রুমে রাখলাম। আর বললাম ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমি আছি। ভাত আর খাওয়া হলো না। আতঙ্ক কাজ করতেছে। কখন জানি না আগুন পুরো হলে ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য শিক্ষার্থীর স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সে ভাবনা থেকে সকলের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার অনেক চেষ্টা করেছি এবং অবশেষে আমরা তা পেরেছি। যদিও বা এর মধ্যে আগুনের কুণ্ডলী জ্বালিয়ে দিয়েছে হলের নিচতলায় থাকা সকল মোটরসাইকেল এবং বাইরে থাকা গাড়িগুলো।

পরিবেশ যখন একটু ঠান্ডা হলো তখন বাইরে বের হয়ে দেখি, আমাদের হলের পরিচ্ছন্ন কর্মী ‘রতনদা’ অঝোরে কাঁদছে। আমি বললাম দাদা কী হয়েছে? সে বলল, দাদা আমি এত করে বললাম, আমি আন্দোলনকারীর কেউ নই। আমি এখানে কাজ করি। আমার বাইকটি পুড়িয়ে দিও না। তাও আমার কথা কেউ শুনল না। আমার স্বপ্নের বাইকটাকে তারা পুড়িয়ে দিয়েছে। অনেক কষ্ট করে যেটি আমি কিনেছিলাম।

পরবর্তীতে ঘোষণা আসল যে হল ছাড়তে হবে। তখন সর্বশেষ ব্যক্তি আমি আর আমার রুমমেট আনোয়ার। নিস্তব্ধ ও থমথমে পরিবেশ বিরাজমান। কখন কী হয়? বলা যায় না, দুজনের মনে ভীতি কাজ করছে। একে অপরের সাথে গল্প করছি। শেষে নিরুপায় হয়ে আমরাও হল ত্যাগ করলাম রাত সাড়ে দশটার দিকে।

খবরওয়ালার চোখে বেরোবির জুলাই

মোঃ আবুল খায়ের জায়ীদ*

ছোটবেলা থেকেই সাংবাদিকতা আমার স্বপ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ পায়। বহু আন্দোলন সংগ্রাম, ক্যাম্পাস সংবাদ ইত্যাদি কাভার করেছি। কিন্তু ২০২৪ সালের জুলাই, এই একটি মাস আমার পুরো সাংবাদিকতা জীবনটাই পাল্টে দিয়েছে। সেটি আর কোনো সাধারণ মাস ছিল না, সেটি ছিল ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার নতুন জন্ম, এক বিপ্লবের ভিতর দিয়ে জন্ম নেওয়া আত্মজিজ্ঞাসার সময়।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝে মধ্যেই আন্দোলন হয়। একদিন, দুইদিন, বড়জোর তিনদিন। কোটাসংস্কার আন্দোলনও তেমনই মনে হয়েছিল শুরুতে। কিন্তু কেন জানি ছোট ছোট সেই প্রতিবাদগুলো কভার করতে গিয়ে একটা মন থেকে টান অনুভব করছিলাম। যেন এই আন্দোলন অন্য সব আন্দোলন থেকে কিছুটা আলাদা। নতুন কোনোকিছু সৃষ্টি হওয়ার স্বপ্ন প্রতিটি শিক্ষার্থীদের চোখেমুখে দেখেছি।

ঐ সময়ে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আন্দোলনে, অন্যদিকে কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও। আর মাঝখানে শিক্ষার্থীদের কোটাসংস্কারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় অচলাবস্থা। তখন আমি একটি শিরোনাম দিয়েছিলাম: “ত্রিমুখী আন্দোলনে অচল বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়”।

১ জুলাই আন্দোলন শুরু হলেও ৩ জুলাই থেকেই আন্দোলনের ছবিটা বদলে যেতে থাকে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের জোরে চাপা পড়েযায় শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আন্দোলন। শিক্ষকেরা ক্লাসবন্ধের হুমকি দিলেও, শিক্ষার্থীরাই নিজেদের ক্লাস বর্জনের ঘোষণা দেয়। শিক্ষকদের ক্লাস করানোর প্রয়োজনই পড়ে না। সেখানেই আমার মতো ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের কাজ অনেক বেড়ে যায়, কারণ এই আন্দোলন আর শুধু দাবি-দাওয়া নয়, এটি ছিল আত্মমর্যাদার লড়াই।

১ থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে যখন শেখ হাসিনা ও আওয়ামীলীগের শীর্ষনেতারা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের রাজাকার বলে অপবাদ দিতে শুরু করেন। এই অপমান যেন আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাতাস উত্তপ্ত হতে থাকে।

প্রতিদিন আন্দোলনের পূর্বাভাস জানতে আমি সিনিয়র-জুনিয়রদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম, তারা আবার ঢাকার সমন্বয়কদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। স্বাধীনতা স্মারকে প্রতিদিনের কর্মসূচি চূড়ান্ত হতো। সবকিছু একটু আগেই জানার চেষ্টা ছিল তখনো।

১৬ জুলাই আমি রংপুরের বাইরে ছিলাম। সেই দিনই ফিরছিলাম গাড়িতে করে রংপুরের উদ্দেশ্যে, আর মোবাইলে খবর নিচ্ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কী হচ্ছে না হচ্ছে। হঠাৎ ফেসবুক লাইভে দেখি একজন রক্তাক্ত শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। এর কয়েক মিনিটের মধ্যে হাসপাতাল থেকেই জানতে পারলাম, সে আর নেই। তার নাম আবু সাঈদ। আমার পরিচিত মুখ, ফেসবুকে আমার সাথে যোগাযোগ হতো প্রায়ই।

---

* শিক্ষার্থী, মার্কেটিংবিভাগ, ১৩ তমব্যাচ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

আমি দেরি করিনি। তৎক্ষণাত কালের কণ্ঠ অফিসে সংবাদ পাঠাই। অফিস থেকে টানা ৪-৫ বার ফোন আসে, “নিশ্চিত তো?” কারণ তখনো কোনো গণমাধ্যমে এই খবর আসেনাই। আমি তাদের বারবার বলেছি, আমি ১০০% নিশ্চিত। আমার বিশ্বাস আবু সাঈদের মৃত্যুর খবর আমিই প্রথম পাঠাই এবং আমার সংবাদ সারা বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ পায় অনলাইন পোর্টালে।

তখন আমি সত্যিই ১৬ জুলাই ভয় পেয়েছিলাম। আমার ক্যাম্পাসে এক শিক্ষার্থীকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা– এটা ভাবতেই আমার শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

আবু সাঈদের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই ছাত্রলীগ ও পুলিশ ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে যায়। উত্তাল হয়ে ওঠে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার আশপাশ। প্রতিবাদে ছাত্রলীগের গাড়িতে আগুন, ভিসি বাংলো, প্রশাসনিক ভবনের সামনে আগুন তখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল।

রাত গভীর হতেই মেস মালিকেরা শিক্ষার্থীদের বাড়িফেরার জন্য চাপ দিতে থাকে। প্রশাসন জরুরি সিন্ডিকেটে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে, মেস মালিকদেরও প্রশাসন থেকে চাপ দেওয়া হয় মেস বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। পরদিন ৫০% শিক্ষার্থী ক্যাম্পাস ছাড়ে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, আবু সাঈদের জানাজায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল।

১৭ জুলাই। গায়েবি জানাজা হয়। সেদিন রংপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীসহ এলাকার কয়েক হাজার মানুষ এই জানাজায় অংশ নেয়। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শহিদ আবু সাঈদের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক ও চত্বরের নামকরণ করে। তখন থেকেই কিছু নতুন মুখ সামনে আসে, যারা ১৬ জুলাইয়ের আগে আন্দোলনে ১% ভূমিকাও ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু তারা আজ বেশ সরব।

১৭ জুলাই রাত থেকে সারা দেশে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ, কিন্তু আন্দোলন থামে না। রংপুরের মানুষের ক্ষোভও পুলিশ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ১৮ জুলাই মডার্ন মোড়ে অবস্থান করে শিক্ষার্থীরা, তাজহাট থানায় হামলা হয়, পুলিশ পিছু হটে। তখন মোবাইল নেটও বন্ধ, আমি ভিডিও লাইভ করেছিলাম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আমি লাইভে বলেছিলাম, এরপর আমি লাইভ শেষ করব কিন্তু কমেন্টে সবাই বলছিল ভাই লাইভ চালিয়ে যান। আমি চোখ বন্ধ করেই ভিডিও করছিলাম আমি চোখে কিছুই দেখতে পারছিলামনা, তাদের কথা রাখার জন্য লাইভ চালাই। আমাকে এক দোকান থেকে মালিক বের করে দিয়েছিল সেইদিন। কারণ আমার কারণে তাদেরকে গুলি করে পুলিশ। সেই ঝুঁকি নিয়ে পুলিশের বন্দুকের নলের সামনে দিয়ে চলে আসি মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে। ঠিক সেই সময় আমাদের সামনেই একজন মারা গিয়েছিল মডার্ন মোড়ে। আমি লাইভ চালিয়ে ছিলাম পাশের বাসার Wi-Fi ব্যবহার করে।

সেই দিন রাতের মধ্যেই Wi-Fi বন্ধ হয়ে গেল। মোবাইল নেট তো অনেক আগেই বন্ধ। অফিসের লোকজন আমাকে কল দিয়ে আমার মুখে বলা সংবাদ শুনে হুবহু লিখে নেয়। ঠিক যেমনটা বলতাম, পরদিন তা পত্রিকায় ছাপা হতো। ইন্টারনেট বন্ধ হলে এভাবেই চলতে থাকে আমাদের ‘খবরওয়ালার’ যুদ্ধ, ৫ আগস্ট পর্যন্ত।

জুলাই বিপ্লব শুধু একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের গল্প নয়, এটা ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার জন্যও এক রক্তমাখা অধ্যায়। আমরা যারা এই সময়ে সংবাদ করেছি, তারা শুধু সংবাদ ছাপাইনি, আমরা রক্তের নিচে থাকা সত্যকে তুলে এনেছি। একটা প্রজন্মকে আমরা সংবাদ দিয়ে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছি “কারা গুলি চালায়, কারা চুপ থাকে, আর কারা ইতিহাস গড়ে?”

জুলাই একটি সাহস ও প্রেরণা, যার বীজ বুনেছে রংপুর

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান*

জুলাই একটি সাহস ও প্রেরণার নাম। যেখানে অবান্তর কোটাকে রুখে দিতে নেমেছিল শহর থেকে গ্রামের হাজারো মানুষ। শিক্ষক শিক্ষার্থী থেকে শুরু হয়ে চাষা– সবাই এতে অংশগ্রহণ করেছে। এ জুলাই আন্দোলন-এর প্রাণ বলা চলে। বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সারাদেশে যখন কোটা না মেধা স্লোগানে মুখর। তখন এ আন্দোলনে তেজ এনেছিল রংপুর। ঢাকায় যখন আন্দোলন শুরু হলো, তখন থেকেই সক্রিয় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

১৬ জুলাই দুপুরে রংপুরের আবু সাঈদ শহিদ হওয়ার এই দৃশ্য যেন জুলাই গণঅভ্যুত্থানেরই প্রতীক। ভয়ংকর সব মারণাস্ত্রের সামনে বুক পেতে দিয়ে দেশকে এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দেন আবু সাঈদ ও তার সহযোদ্ধারা। যা অভ্যুত্থানের তেজকে দ্বিগুণ করে তোলে। বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণের এই লড়াইয়ে সারা দেশের মতো রংপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-জনতাও অংশ নেন। আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে, ঢাকা-রংপুর, কুড়িগ্রাম মহাসড়ক, আবু সাঈদ চত্বর ও অর্জন মোড়সহ পুরো রংপুর। শহিদ হন আবু সাঈদসহঅনেক শিক্ষার্থী। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রতিদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে অভ্যুত্থানের দুই দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রক্তাক্ত ১৬ জুলাই; অভ্যুত্থানের বীজ

১৬ জুলাই। অন্যরকম অভিজ্ঞতা। সাংবাদিকতা জীবনে এ স্মৃতি ভোলার মতো নয়। তখন এ পেশায় তিন মাসের একটু বেশি সময় চলে।তারপর মেসে থেকে বের হলাম। আন্দোলন শহর থেকে দুপুরের দিকে ক্যাম্পাসের দিকে এসেছিল। তাই রুমে আর দেরি না করে ছুটলাম। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তাদের সাথে দেখা। তারা যেন আজ অন্য দিনের চেয়ে বেশি স্লোগানে মুখর। বিপ্লবী আওয়াজে তারা এগিয়েই চলছে। তাদেরকে কে দমাবে কার এত শক্তি। মিছিল চলছিল যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং ফটক বর্তমান আবু সাঈদ গেটে আসলো, তখনই পুলিশি বাধা।

শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে ঢুকতে চাইলে তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। একটু পর মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করতে মুহুর্মুহু গুলি ছাড়তে থাকে পুলিশ। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ রংপুর যুবলীগ ও ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন ক্যাডার বাহিনীরা হামলা চালায় শিক্ষার্থীদের ওপর। শিক্ষার্থীদের হাতে ছিল পতাকা ইটপাটকেল। এদিকে ছাত্রলীগের হাতে ছিল রামদা, রেকি সহ অনেক ধরনের অস্ত্র। একবার শিক্ষার্থীরা এগিয়ে আসে আরেকবার পুলিশ সহ ছাত্রলীগ।

একটা সময় এলো ঘড়ির কাঁটায় দুপুর থেকে বিকেল গড়াবে সম্ভবত, এমন সময় কিছু শিক্ষার্থী এগিয়ে এলেন আন্দোলন নিয়ে। যা ছিলো গেইটের সামনে। এমন সময় পুলিশ গেইটের বিপরীতে পেয়ে তাদেরকে আহত করে। তাদের মধ্যে ছিল আবু সাঈদ।

এর পরের বার যখন আবু সাঈদ সামনে আসলো, তার তেজ যেন বেড়ে গেল দ্বিগুণ। তাকে কে দমাবে? তাকে থামানোর শক্তি কার আছে? তার বুকের ভেতর ঝড় মনে হয় দ্বিগুণ হলো। পুলিশের সামনে বুক টান করে দাঁড়াল আবু সাঈদ। পুলিশও বাদ গেলনা। পিস্তলের নল দিয়ে বুক ঝাঁঝরা করতে। একের অধিক গুলি খেলেন তবুও ঢলে পড়ল না সে। সে একটু পিছনে গিয়ে বসার চেষ্টা

*শিক্ষার্থী ও সাংবাদিক, সমকাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

করল। তারপর তার সহপাঠীরা তাকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে গেল। এ সময়গুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য জায়গায় অনেক শিক্ষার্থী গুলির আঘাতে আহত হলেন। অনেকের রক্তে আবু সাঈদ হলো অগ্নিগর্ভ।

আন্দোলন দ্বিগুণ হলো যখন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে খবর এলো ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ আর নেই। রণক্ষেত্রে পরিণত হলো আবু সাঈদ চত্বর। তারপর আন্দোলনকারীরা ভাইয়ের রক্তাক্ত লাশ নিয়ে চলল ক্যাম্পাসের দিকে। কিছু শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগোচ্ছিল। এমন সময় বাধা দিয়ে তাদের কাছ থেকে লাশ কেড়ে নেওয়া হলো। তখন বিকেল, এদিকেও তেজ আরও দ্বিগুণ বাড়তে থাকল।

পুলিশ তার বন্দুকের নল দিয়ে আর আটকাতে পারলো না শিক্ষার্থীদের। এ সময়টাই ছাত্রলীগ ও যুবলীগ অঙ্গ সংগঠনের যারা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়াল টপকে পালিয়ে যায়। শিক্ষার্থীরা সবাই তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এরপরই ছাত্রলীগের গাড়িসহ বিভিন্ন বস্তু পুড়িয়ে দেয়। তবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো কাটেনি। কখন যে ছাত্রলীগরা হামলা করে মেসে থাকা ছাত্রদের ওপর? এ নিয়ে ভয়ে ভয়ে রাতটা কেটেছিল।

১৮ জুলাই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অভ্যুত্থানের তেজ

দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। সবাই আন্দোলন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। এই দিনে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। ছেলে শিক্ষার্থীর পাশাপাশি সেদিন অনেক মেয়ে শিক্ষার্থীর কণ্ঠে ছিল বিপ্লবী স্লোগান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেই যে মহাসড়কগুলো ছিল, তা যেন পূর্ণ ছিল প্রায়। তারা আবু সাঈদ চত্বরে কিছুক্ষণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করল। তারপর তারা চলল মর্ডানের দিকে। সেখানে পুলিশ র‍্যাব সহ স্পেশাল ফোর্সের বিভিন্ন বাহিনী অপেক্ষমাণ ছিল। এখানেই ব্যাপক গোলাগুলি চলে। একবার শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে ধাওয়া। আরেকবার অন্যান্য বাহিনীর পক্ষ থেকে ধাওয়া।

যখন শিক্ষার্থীরা মর্ডানের দিকে এসেছিল। সেখানকার এলাকাবাসীরা বসে থাকতে পারেনি। পরিবার নিয়ে ছুটে এসেছেন। তাদের মুখে এক গ্লাস পানি খাওয়াতে। এ দিনটি ছিল বিমর্ষ, কিন্তু ছাত্ররা যেন তাদের শক্তি দ্বিগুণ করতে পেরেছিল এ সময়। ওদের অধিক বার পাল্টাপাল্টি আক্রমণ হয়। এ সময় অনেকেই গুলির আঘাতে আহত হয়। শহিদ হন মানিক। পেশায় অটোচালক। যার বাড়ি মডার্ন এলাকায়। এরপর যখন শিক্ষার্থীরা এগিয়ে আসতে শুরু করে, তখন চলে যেতে বাধ্য হয় পুলিশসহ অন্যান্য বাহিনী। এরপর জ্বালিয়ে দেওয়া হলো তাজহাট থানা।

আমার কাছে জুলাই মানে প্রেরণা। সময়টা সাংবাদিকতার হাতেখড়ি আমার। শিখেছি অনেক কিছু, দাঁড়িয়েছি অন্যায়ের বিপক্ষে। আমার অস্ত্র ছিল কলম টাইপোড ও আমার চোখ। এ আর কম কি। আমি স্লোগান দিতে পারেনি, স্লোগান দিয়েছে আমার চোখ। স্লোগান দিয়েছে আমার কলম, আমার নোটপ্যাড, স্লোগানে মুখরিত হয়েছে আমার নিউজ পোর্টাল। এ আর কম কীসের! জুলাই আন্দোলনের সময়গুলো অনেক কিছু শিখিয়েছে। সাংবাদিকতায়তেজ এনেছে। ক্যাম্পাস সাংবাদিক হিসেবে এরকম একটি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান আর সত্যিকারের মানুষ মনে হয়েছে। জুলাই আন্দোলনের মূল প্রেরণা থাকুক মাটি, আকাশ এবং মানুষের মধ্যে। আগলে থাকুক সবার গান, কবিতা ও রচনা শিল্পতে। যেন ইতিহাস থেকে মুছে না যাক, আর কোনো বৈষম্য না থাকুক।

শহিদ আবু সাঈদ একটি নাম, একটি ইতিহাস

আবু সাঈদ*

১৬ জুলাই, ২০২৪। দুপুরের খাবার খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় জানতে পারি জুলাই আন্দোলনের মিছিল শুরু হয়ে গেছে। তখন খাওয়া বাদ দিয়ে দ্রুত প্রস্তুত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চলে আসি নিজের দায়িত্ব পালন করতে। এসে দেখি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়) ২নং গেইটের দিক থেকে (মূল ফটক) মিছিল নিয়ে মর্ডানের দিকে আগাচ্ছে। আর কিছু পুলিশ আন্দোলনকারীদের সামনে এবং পুলিশের একটি দল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেইট (বর্তমানে শহিদ আবু সাঈদ গেইট) বন্ধ করে দিয়ে গেইটের সামনে অস্ত্রসহ অবস্থান নিয়েছে। আর ভিতরে অবস্থান নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী এবং আওয়ামীপন্থী কিছু শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে তাতে বাধা দেয় পুলিশ। শিক্ষার্থী এবং পুলিশ একে অপরকে বুঝানোর চেষ্টা চলে কয়েক মিনিট পর্যন্ত। কিন্তু পুলিশ কিছুতেই শিক্ষার্থীদের মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রবেশ করতে দিবে না বলে জানিয়ে দেয়। তারপর পুলিশ-শিক্ষার্থী বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে, এক পর্যায়ে পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর ব্যাপকহারে লাঠিচার্জ শুরু করে এবং শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানেগ্যাস আর ছরাগুলি ব্যবহার করে। শুরু হয় ধাওয়া-পালটা ধাওয়া। এতে প্রায় সকল শিক্ষার্থী পালিয়ে গেলেও আবু সাঈদসহ কয়েকজন গেইটর বিপরীত পাশে একটু দূরে দোকানের পাশের গলিতে অবস্থান নেয়। কিন্তু সবার সামনে দোকানের পাশে এক বুক সাহস আর বিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন আবু সাঈদ। তার আশেপাশে ছিলেন গুটিকয়েক শিক্ষার্থী। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন পুলিশ তো তাদের-ই কারো না কারো ভাই বা বোন। পুলিশ তাদেরহয়তো একটু ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু নির্দয় পুলিশগুলো তার সেই বিশ্বাস পরক্ষণেই ভেঙে চুরমার করে দেয়। পুলিশ যখনই দেখলেন আবু সাঈদ একটি লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, তখনই পুলিশ অতর্কিতভাবে তাঁর ওপর আক্রমণ করে। ৬(ছয়) জন পুলিশ গিয়ে তাকে বেধড়ক পিটাতে শুরু করে এবং ৬(ছয়) জন পুলিশ মিলে কয়েক মিনিট ইচ্ছেমত পিটায়। এতে তার মাথা ফেটে যায়। তাতেও ধৈর্য এবং সাহস হারাননি শহিদ আবু সাঈদ। এর পর আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরাও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পুলিশকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে শুরু করে। ছয় জন মিলে কয়েক মিনিট ইচ্ছেমত পেটানোর পর ঐ পুলিশগুলো আবার গেইটের সামনে তাদের দলে চলে আসে। তারপর ভিতরে প্রবেশ করে গেইট বন্ধ করে দেয়। আবু সাঈদ তার মাথার রক্ত মুছতে মুছতে সামনের দিকে এগিয়ে আসে।

এর একটু পর নির্দেশনা পেয়ে তারা পরিকল্পনা করে গেইট খুলেই শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে ছর্‌রাগুলি, কাঁদানেগ্যাস রাবার বুলেট ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসে পুলিশ। এ সময় অন্য শিক্ষার্থীরা পালিয়ে গেলেও আবু সাঈদ পুলিশের সামনে দুহাত প্রসারিত করে বুক চেতিয়ে বীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তখন তার মাথা থেকে রক্ত ঝরতে দেখা যায়। আর এসময় পুলিশ তার খুব কাছ থেকে ঠান্ডা মাথায় তাঁর বুকের দিকে তাক করে একাধিক রাউন্ড গুলি চালায়। প্রথমবার গুলি খেয়ে কেঁপে ওঠে আবু সাঈদ। আবার শক্তি জড়ো করে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে। এর মধ্যে পুলিশ আবার তাঁর বুকে গুলি চালায়। এই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় শহিদ আবু সাঈদের বুকসহ সারা শরীর। এ

---

*শিক্ষার্থী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর ।সহ-সভাপতি: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি।

সময় তীব্র ব্যথা সহ্য করতে না পেরে বুক চেপে ধরে কয়েক পা হাঁটার পর বসে পড়ে। পরক্ষণেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরবর্তীতে আশেপাশের সহযোদ্ধারা তাকে মাটি থেকে তুলে পার্কের মোড়ের (আবু সাঈদ চত্বর) দিকে নিয়ে যেতে চাইলে নির্দয় পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তারপরও তার সহযোদ্ধারা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতাল নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

এদিকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরও শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ-ছাত্রলীগ ধারালো অস্ত্রসহ যৌথ হামলা চালাতে থাকে। চলতে থাকে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। এর মধ্যে পুলিশ-ছাত্রলীগের সাথে ধারালো দেশীয় অস্ত্রসহ এবং অস্ত্রবিহীন মোটরসাইকেল নিয়ে দলে দলে যোগ দেয় রংপুর শহরের বিভিন্ন স্তরের আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। শিক্ষার্থীদের ওপর চালায় যৌথ হামলা। এতে অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়। হামলায় নেতৃত্ব দিতে এবং শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে দেখা যায় শিক্ষক মশিউর রহমান ও আসাদ মণ্ডল, কর্মকর্তা রাফিউল হাসান (রাসেল) এবং তৌহিদুল ইসলামসহ (জনি) বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীকে।

আবু সাঈদের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করে পুলিশ, ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ মিলে গেইট বন্ধ করে দেয়। পুলিশসহ পালিয়ে যায় হামলাকারী আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। সহযোদ্ধার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। পরক্ষণেই ঘটনাস্থলে শিক্ষার্থীদের আরেকটি দল এসে উপস্থিত হলে সবাই মিলে গেইট খুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীরা। ততক্ষণে পালিয়ে যায় পুলিশসহ হামলাকারী ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা।

আবু সাঈদকে পিটানো এবং গুলি করার ভিডিও এবং ছবি ধারণ করতে দেখে ঐ সময় পুলিশ আমাদের (সাংবাদিকদের) লক্ষ্য করে একাধিকবার কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে, যেন আমরা (সাংবাদিকরা) এসবের ভিডিও এবং ছবি ধারণ করতে না পারি। শহিদ আবু সাঈদকে গুলি করার পরক্ষণেই জন্ম নেয় এক নতুন ইতিহাস। একজন বীরের বীরত্বের ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী হয়ে যাই আমরাও।

এবার আসি ১৬ জুলাইয়ের আগে ঘটে যাওয়া ১১ জুলাইয়ের ঘটনায়। ১১ জুলাই সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্ণচূড়া সড়ক থেকে মিছিল নিয়ে দেবদারু সড়কে আসলে পুলিশ ও প্রক্টরের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি পোমেল বড়ুয়া এবং সাধারণ সম্পাদক শামীম মাহফুজের নেতৃত্বে আবু সাঈদ ও তার সহযোদ্ধাদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ। সেটি নিয়ে সাবেক প্রক্টর মোঃ শরিফুল ইসলাম এবং তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। তবেশিক্ষার্থীরা প্রক্টরের উওপর হামলা করেছে বলে যে মিথ্যা অভিযোগ ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল, প্রক্টর তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

আমরা আবার ১৬ জুলাইয়ে ফিরে যেতে চাই। ১৬ জুলাই আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডের পর শহিদ আবু সাঈদের বীরত্ব এবং পুলিশের নিষ্ঠুর আচরণের কারণে এই হত্যাকাণ্ড ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। দেশের সীমানা অতিক্রম করে পৌঁছে যায় আন্তর্জাতিক মহলেও।

ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দেশের সাধারণ জনগণসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। ফলে আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানে। পরিশেষে ৫ আগস্ট পতন হয় স্বৈরশাসকের। জন্ম নেয় স্বৈরশাসকমুক্ত নতুন বাংলাদেশ।

ঘটনার তারিখ: ১৬ ও ১১ জুলাই, ২০২৪।

জুলাই আন্দোলনের ও অভ্যুত্থানের কিছু কথা

হুমায়ূন কবির*

জুলাই আন্দোলনের সূচনা হয় কোটা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।দীর্ঘ দিন ধরে যখন আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিজেদের দাবির পক্ষে ও অযৌক্তিক কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলনে করতে থাকি, তৎকালীন সরকার প্রথমে সেটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি। এভাবে একপর্যায়ে আন্দোলন বেগবান হয় এবং এই সরকারের পতন ঘটে। এই আন্দোলনে আমার জার্নিটা খুব কষ্টকর ছিল।

আমরা দীর্ঘ দিন ধরে কোটার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি প্রতিনিয়তই আন্দোলনে গিয়েছি। প্রথম দিকে সেরকম কোনো বাধার মুখে না পড়লেও ১৪ জুলাই যখন শেখ হাসিনা সাধারণ শিক্ষার্থীদের রাজাকার উপাধি দেই। সেইদিন রাতে আমরা বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা সাধারণ শিক্ষার্থীরা মিছিল বের করি। আমি থাকতাম ভার্সিটির পাশেই সর্দার পাড়ায়। আমরা কিছু বন্ধু মিলে যখন রাতে মিছিলে যাওয়ার জন্য মেস থেকে বেরিয়ে যাই। তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে ছাত্রলীগের ছেলেরা আমাদের দেখে রাখে। পরবর্তীতে মিছিলটি মডার্ন মোড় হয়ে ওইদিক দিয়ে কারমাইকেল কলেজের পাশে দিয়ে লালবাগ যায়, আবার ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে ছাত্রলীগের কর্মীরা ক্যাম্পাসের ভিতরে দেশীয় অস্ত্র লাঠি নিয়ে আগে থেকেই উপস্থিত থাকে। ক্যাম্পাসের ভেতরে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি মোড়ে ছাত্রলীগের কর্মীরা অতর্কিতভাবে মিছিলে থাকা শিক্ষার্থীদের গালিগালাজ করে। এক পর্যায়ে তারা আমাদের ওপর আক্রমণ করে। সেদিন একসময় অনেক ঝামেলা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও বাইরের প্রশাসন পরিস্থিতি শান্ত করে আমাদের ক্যাম্পাসের বাইরে বের করে দেই।

পরের দিন ১৫ জুলাই আমি ক্যাম্পাসের দিকে যাচ্ছিলাম। সেদিন ছাত্রলীগের কর্মীরা কাউকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দিতনা। ক্যাম্পাসের রাস্তায় দাঁড়ালেও ধরে নিয়ে অনেক গালিগালাজ করত ও মারত। আমি সেদিন বের হয়ে ক্যাম্পাসের ১নং গেটের বিপরীতে চায়ের দোকানে গেলে ছাত্রলীগের কর্মী টোগর আমাকে ধরে গালিগালাজ করে। এক পর্যায়ে আমাকে ধরে হলে নিয়ে গিয়ে হাত পা ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেয়। আমাকে জোর করে হলে নিয়ে যাওয়ার সময় কিছু দূর যাওয়ার পথে একজন পরিচিত ব্যক্তি তাদের কাছে থেকে আমাকে নিয়ে একপাশে দিয়ে বের করে দেয়। আমাকে বলে আমাকে যেন আর কখনও না দেখে। এইদিকেও যেন না আসি। এইবার পাইলে আমার হাত পা সব ভেঙে ফেলা হবে।

১৫ জুলাই রাতেই সকল সাধারণ ছাত্ররা আমরা যার যার মতো করে যোগাযোগ শুরু করি। পরের দিন ১৬ জুলাই একটা বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তুলার জন্য। আমরা একটা আন্দোলনের পরিকল্পনা করি, সেই পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায় ছাত্রলীগের কাছে। সেদিন রাতে থেকে অনেক হুমকি-ধামকি দেওয়া হয়। ১৬ জুলাই আমরা যার যার মতো বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করে আন্দোলনের পরিকল্পনা পরিবর্তন করি। সকলেই ক্যাম্পাসের চারপাশে পুলিশ, ডিবি ও র‍্যাব ক্যাম্পাসের গেট বন্ধ করে রাখে। ক্যাম্পাসের আসে পাশে কাউকে দাঁড়াইতে দিতোনা। আমরা সবাই পরিকল্পনামাফিক আন্দোলন টা ১ ঘণ্টা আগে নিয়ে আমি রংপুরের চারতলা মোড় থেকে শুরু করার পরিকল্পনা করি। তখন রংপুরে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীরা আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে

*হুমায়ূন কবির, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

ক্যাম্পাসের দিকে আসতে থাকে। সেদিন প্রায় ১০(দশ) হাজার ছাত্রছাত্রীর সমাগম হয়। আমাদের মিছিলটি ১নং গেটের সামনে আসলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। আমার ক্যাম্পাসের গেটের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। পরবর্তীতে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ অতর্কিতভাবে আমাদের ওপর রাবার বুলেট আর টিয়ারসেল গ্যাস ছুড়ে। এক পর্যায়ে অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়, বুলেটের আঘাতে ও গ্যাসের কারণে। সেই সাথে দেশীয় অস্ত্র ও ইটপাটকল নিয়ে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। এক পর্যায়ে আবু সাঈদ ভাই এরকম বর্বর অত্যাচারেপুলিশের সামনে বুক পেতে দেয়। পুলিশ তাকে খুব কাছে থেকে গুলি করে। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তারপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি।

আবু সাঈদ ভাই মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে রংপুরের স্থানীয়রা আমাদের সাথে আন্দোলনে যোগ দেয় এবং পুলিশ ও ছাত্রলীগের কর্মীদের পিছু হটাতে বাধ্য হয়।

সেইদিন রাতে আমাদের হুমকি দেওয়া হয়, আমাদের মেস মালিক মেস থেকে রাত ১০টার মধ্যে বেরিয়ে যেতে বলে। বাধ্য হয়ে মেস থেকে বের হতে হয়। লুকিয়ে লুকিয়ে সারারাত না ঘুমিয়ে কাটে। আরো অনেক ঘটনা না বলাই রয়ে গেল।

“আবু সাঈদ দ্রোহ ও একটি আলোর নাম”

সাদিয়া শারমিন প্রমি*

আবু সাঈদকে নিয়ে এবং বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন, বলুক। আমিও প্রতিবাদ জানাই। তবে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এ যুবাকে নিয়ে কিছু বলার আগে একটা গল্প বলি। এক ছাত্র আর এক শিক্ষকের গল্প। এক শিক্ষক ও এক কৌতূহলপ্রবণ ছাত্র ছিল। একজন শিক্ষক ছাত্রকে আলো নিয়ে পড়াচ্ছেন। ছাত্র কৌতূহল নিয়ে শুনছে, প্রশ্ন করছে। ছাত্র বলে, আলো কী? ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষক বলেন, আলো হলো শক্তি, আলো হলো দিশারি। ছাত্র আবার বলে, আলো কি থামিয়ে রাখা যায়? শিক্ষক বলেন, থামানো যায় না, তবে চেষ্টা করা যায়; কিন্তু লাভ হয় না। ছাত্র বলে, কেন? আলোর উৎস নিবিয়ে দিলেই হয়? শিক্ষক বলেন, হুম! ঐ যে বললাম চেষ্টা করা যায় কিন্তু বৃথা। কারণ আলো কেবল বাস্তবিক নয়, যে আলো সত্যর, ন্যায়ের, ভালোবাসার ও প্রতিবাদের। এ আলো নিভানো তো যায়ই না, বরং বাধা দিলে দ্বিগুণ হয়ে ফেরে। ছাত্র আবার প্রশ্নে ফেরে। চলে প্রশ্ন-উত্তর খেলা। হয়তো কৌতূহল মিটলে আর শিক্ষার প্রকৃত প্রতিফলন পেলে থেমে যায়।

আলোর আরেক নাম আবু সাঈদ, যে আলোর যুবার পথ অবিরাম। কোনো বিরাম হয়তো চাইলেও পাওয়া মুশকিল। কারণ, বিগত এক বছর যে বিচারহীনতার করুণ ও নির্মম দৃশ্যপট আমার এবং সমগ্র জাতির চোখে দৃশ্যমান সেটার অমায়িক প্রতীক হলো আবু সাঈদ ও আবু সাঈদ হত্যার বিচার। আবু সাঈদ হত্যার বিচারে যে তালগোল, ঘোলা জলের অর্থহীন অবস্থা দেখি তা যেন আশ্চর্য নিদর্শন; সে নিদর্শন আর যাই হোক, কোনো রাষ্ট্রের জন্য সুখকর নয়।

William Ewart Gladstone-এর একটা চরম বাস্তব খাঁটি সত্য কথা আছে, যা না বলে পারা যায় না, “Justice delayed is justice denied” কথাটা মারাত্মক সত্য “দীর্ঘসূত্রতা ন্যায়বিচারকে অস্বীকার করে”। কে এই আবু সাঈদ? তিনি ছিলেন একজন শিক্ষার্থী ও ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের কোটাসংস্কার আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। তিনি এই আন্দোলনের রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সমন্বয়ক। তিনি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই আন্দোলন চলাকালে দুইজন পুলিশ সদস্যের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি এই আন্দোলনের প্রথম শহিদ।

ছাড়পত্র কবিতায় নবজাতকের জন্মগত অধিকার এবং নিরাপদ পৃথিবীর দাবি জানিয়েছেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য,তিনি লিখেছেন, “যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে/ তার মুখে খবর পেলুম; সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক/নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করেন অধিকার/ জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে” আবু সাঈদও সুতীব্র চিৎকারে, মুষ্টিবদ্ধ হাতে ব্যক্ত করেছিল তার জন্মগত অধিকার ও বেঁচে থাকার অধিকার। হ্যাঁ নিরাপদ পৃথিবীর অধিকার।

অসংখ্য শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের এ স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতার ৫৩ বছরে আমাদের অর্জন অনেক; কিন্তু ব্যর্থতাগুলোকেও চোখের আড়াল করার সুযোগ নেই। এই স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্ন ছিল শুধু বিচারব্যবস্থা, যেখানে আর কোনো অন্যায়-অবিচার হবে না। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, এত আলোচিত এক হত্যাকাণ্ড আবু সাঈদ হত্যার এক বছর

*শিক্ষার্থী,বি.এ (অনার্স), ৩য় বর্ষ, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

পার হয়ে যাওয়ার পর আজও হত্যাকারীদের শাস্তির বিচার সম্পন্ন হয়নি। এই বিচারিক কার্যক্রম আমাদের জন্য হতাশাজনক।

তবুও আবু সাঈদের মা-বাবা এখনো বিশ্বাস রাখেন 'অবিচার শেষ কথা নয়'। মানুষের অন্তর্গত শক্তিতে বিবেক ও চেতনার ঝড়ে এদেশের সন্তানেরা একদিন মহৎ ব্রত নিয়ে এই বাংলাদেশকে শিশুর বাসযোগ্য করে তুলবে। যেখানে বাস্তবায়িত হবে তাঁর সন্তান ও আবু সাঈদের স্বপ্ন। এখানে আবু সাঈদকে বাঁচতে দেওয়া না হলেও এই দেশ আবু সাঈদেরই দেশ। আবু সাঈদের বাবা-মা হয়তো এখনো আশায় বুক বাঁধেন যে একদিন তাদের সন্তান হত্যার বিচার তাঁরা পাবেন। ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রভাবের ঊর্ধ্বে গিয়ে আইন আবু সাঈদের খুনিদের বিচার করবে। সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনবে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার ওপর। আবু সাঈদের আত্মা আমাদের স্বরণ করিয়ে দেবে, 'জীবন যেখানে দ্রোহের প্রতিশব্দ, মৃত্যু সেখানে শেষ কথা নয়'।

জুলাই নিয়ে স্মৃতিচারণ

আহমাদুল হক*

আমি আপনাদের সহপাঠী, কোটা আন্দোলনকারী এবং মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান। ঠিক এই কথাগুলো দিয়ে শুরু করেছিলাম বক্তব্য ৮ জুলাই তারিখে মডার্ন মোড়ে।

সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধারা কখনো অন্যের অধিকার হরণ করেন না। তারা সবসময় দেশের জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকেন। এই শিক্ষাটাই আমি পেয়েছি একজন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান হয়ে।

২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে যখন দেখি তৎকালীন ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকার সরকারি চাকরিতে অন্যায়ভাবে কোটা চাপিয়ে দেয়, তখন সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের হাওয়া বইতে থাকে। সবাই একে একে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমিও ঘরে বসে থাকতে পারলাম না, চলে গেলাম আন্দোলনে ও দেশপ্রেমের টানে।

৮ জুলাই থেকে আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠি। ওইদিনই মর্ডান মোড়ে মুক্তিযোদ্ধার নাতি হয়ে কোটা আন্দোলনের পক্ষে কথা বলি। এটা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশ হলে তৎকালীন বেরোবির ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের চোখে পড়ি। এরপর বাড়ি থেকে চাপ আসতে থাকে। কয়েকজন আওয়ামী নেতা আমার নানার মুক্তিযোদ্ধার সনদ বাজেয়াপ্ত করার হুমকিও দেয়। তবুও দমে যাইনি-নিয়মিত অংশগ্রহণ করে যাই।

১৫ জুলাই আন্দোলনে থাকতে পারিনি। তখন শুনি ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বেরোবির শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। মনের মধ্যে ক্ষোভ জন্ম নেয়। ১৬ তারিখ রংপুর শহরের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আন্দোলনকারীরা একত্র হয়। আমিও দুপুর দুইটার দিকে পার্ক মোড়ে উপস্থিত হই।

আমাদের কিছু ভাইকে হলে আটকে রাখে ছাত্রলীগ কর্মীরা। আমরা ঠিক করি, তাদের ছাড়া মর্ডান মোড়ে যাব না। আমাদের অবস্থান ছিল আবু সাইদ গেটের বাইরে। আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম।

তখন গেটের ভেতর থেকে ছাত্রলীগের কর্মীরা ঢিল ছুড়ে, প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আন্দোলনকারীরাও ঢিল নিক্ষেপ করে। কিছুক্ষণ পরে গেটের ভেতর থেকে পুলিশ এসে লাঠিচার্জ করে এতেঅনেকে আহত হন এবং আবু সাইদও আহত হন।

আমরা হঠাৎ আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হলেও আবার সংঘবদ্ধ হই এবং কাউন্টার অ্যাটাক করি। পুলিশ গেটের ভেতরে সরে যায়। তারপর কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে গুলি ও টিয়ারশেল ছুড়তে থাকে। আবারআমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই।

মুহুর্মুহু গুলির মাঝেই এগিয়ে আসে আমাদের ক্ষণজন্মা বীর আবু সাইদ। বুক পেতে দাঁড়ায় ঘাতকের সামনে। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তার বুক। নিথর দেহ লুটিয়ে পড়ে। কয়েকজন তাঁকে নিয়ে যায় মেডিকেলে।

---

*শিক্ষার্থী, একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

আমি দেখতে পাই আমার এলাকার ছেলে, ক্যাম্পাস সাংবাদিক আবরার সামিন (MIS-14), সেও গুলিবিদ্ধ। তাকেও নিয়ে যায় মেডিকেলে।

তার প্রাথমিক চিকিৎসার সময় আমি অন্য বেডগুলো দেখতে গিয়ে জানতে পারি, বেরোবির এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। কিছুক্ষণ পর আবু সাইদ ভাইয়ের নিথর দেহ দেখতে পাই। দেখতে পাই পুরো বুক ঝাঁঝরা হয়ে আছে গুলিতে। রাতে মেসে ফিরে যাই। দুঃখের বিষয়, আবু সাইদ ভাইয়ের নিহত হওয়ার রাতেই হুমড়ি খেয়ে বেরোবির অধিকাংশ শিক্ষার্থী বাড়ি ফিরে যায়।

বাড়ি যাওয়ার সময় আমার জেলার বড় ভাই জাকির ভাইও আমাকে যেতে বলেন। আমি বলি, "সবাই যদি মাঠ ছেড়ে চলে যায়, আন্দোলন করবে কে?"

রাতটা ছিল কিছুটা নিস্তব্ধ ও ভারাক্রান্ত। এরপর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করি। সিদ্ধান্ত নিই, হয়তো বাঁচব, নয়তো মরব। কিন্তু এর শেষ দেখে ছাড়ব।

পরদিন, ১৭ তারিখ, আমাদের ক্যাম্পাসে আবু সাইদ ভাইয়ের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সবার মধ্যে তখন চাপা ক্ষোভ, যার প্রকাশ ঘটে ১৮ জুলাই।

সে দিন মর্ডান মোড়ে পুরো রংপুরবাসী পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুড়িয়ে দেয় থানা। পুলিশ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে যায়।

১৯ তারিখে আন্দোলন চলতে থাকে। ঐ রাতেই কারফিউ জারি হয়। ইন্টারনেট ও যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। রংপুরে তখন মাত্র গুটিকয়েক বেরোবি আন্দোলনকারী ছিল।

কারফিউর সময়টা পার করি, আতঙ্ক আর আশঙ্কার মধ্যে। কারফিউ শেষে দেখি কয়েকদিন আন্দোলন থেমে গেছে। এটা দেখে হতাশ হয়ে পড়ি ভাবি, স্বৈরাচার বুঝি টিকে গেল।

হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। তখন নিউজে দেখি, ডিবি হারুন আন্দোলনের সমন্বয়কদের বন্দি করে জোরপূর্বক আন্দোলন বন্ধের বিবৃতি আদায় করে নেয়।

তবে অন্য সমন্বয়কারীরা সেই বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করে আবারো আন্দোলনের ডাক দেয়। আন্দোলন চলতে থাকে। আমিও শামিল হই নোয়াখালীতে।গত ৪ আগস্ট মাইজদীতে আন্দোলন শেষে ফেরার পথে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে অবরুদ্ধ হই। প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে তারা আমাকে নির্যাতন করে।

পরদিন, অনেক উত্তাপ আর উত্তেজনার মধ্যেই হাসিনার পতনের সংবাদ পাই। তখন হাজারো মানুষের আত্মত্যাগের ভিড়ে নিজের সামান্য ত্যাগকেও সফল মনে হয়। গর্ব করি আমার নানা একজন '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা, এবং আমিও '২৪-এর একজন যোদ্ধা।

২৪-এর আন্দোলন: একটি শিক্ষক, একটি হৃদয় ও একটি জাতির লড়াই

মোঃ সোহেল রানা*

আলোর বিপরীতে দাঁড়ানো অন্ধকার

২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের কোটাসংস্কার আন্দোলন-এটি কেবল একটি রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, বরং এটি ছিল একটি জাতির আত্মার পুনর্জাগরণ। একজন শিক্ষক হিসেবে আমি কখনো কল্পনাও করিনি যে একদিন আমাকে রাজপথে দাঁড়াতে হবে। আমার ছাত্রদের পাশে, চোখে চোখ রেখে অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে হবে। কিন্তু ইতিহাস যখন ডাক দেয়, তখন নীরব থাকা পাপ।

শিক্ষার্থীদের ওপর যখন নির্মম নির্যাতনের খবর আসছিল চারদিক থেকে, নৈতিক প্রতিরোধকে পেশিশক্তির জোরে থামিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছিল, তখন আমি আর চুপ থাকতে পারিনি। ভিতর থেকে এক নৈতিক তাড়না আমাকে নাড়িয়ে দেয়। আমি প্রতিবাদের পক্ষেই দাঁড়াই।

১৬ জুলাই: এক প্রতীকী সূচনা

১৬ জুলাই যাত্রাবাড়ী কাজলার মোড়ে ছাত্রদের সমর্থনে একটি মিছিলে ছাত্রদের কাঁধে কাঁধ রেখে দাঁড়াই। সেই ছবি আমি ফেসবুকে পোস্ট করি। তা দ্রুত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আমি বুঝতে পারি-শিক্ষক হিসেবে আমার অবস্থান আজ শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ নয়; রাজপথেও আমার জায়গা আছে, কারণ ওখানেই আজ শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি।

১৮ জুলাই: রাজপথে প্রথম পদচারণা

১৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার, আমি সরাসরি আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করি। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার কলেজের রাফি, আবির, ইডেন কলেজের সুমি, উদয়নের নাবিল এবং অসংখ্য ছাত্র-জনতা।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় পুলিশ আমাদের ওপর গুলি, সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার গ্যাস ছুড়ে হামলা করে। চারদিকে ধোঁয়া আর আতঙ্ক। চোখে জ্বালা, বুক কাঁপে, তবুও আমরা পিছু হটিনি। আমি এক পর্যায়ে একটি ঘরে আটকে পড়ি। ঘরের ভেতর থেকে বাইরে পুলিশের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল, বুঝি এখনই দরজায় লাথি মেরে গুলি করে মেরে ফেলবে।

চার ঘণ্টা পর পরিবেশ কিছুটা শান্ত হলে আজিমপুর ত্যাগ করি। পরে বুঝলাম, শুধু আজিমপুর নয়-সমগ্র ঢাকা জ্বলছে। যেন পুরো শহর এক পুড়ে যাওয়া মানচিত্র।

১৯ জুলাই: কারফিউ আর আতঙ্কের রাত

সরকার কারফিউ জারি করল। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমনের নামে শুরু হলো বিরোধী দল-মত নিধনের অভিযান। আমাদের বাসাতেও পুলিশ হানা দেয়, কিন্তু কাউকে খুঁজে পায় না। আশপাশে শুরু হয় 'গ্রেপ্তার বাণিজ্য'। DMRC এর শিক্ষক সাইদুর রহমান স্যার, জুয়েল স্যার ও বেলাল স্যার-সবাই ভয় উপেক্ষা করে আন্দোলনে অংশ নিতে থাকলেন।

২৪-২৫-২৬ জুলাই: রাজপথে দৃঢ়তা

২৪ জুলাই বকশীবাজারে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শামীম স্যারের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নিই। উনার সাহসিকতা আমাকে আলোড়িত করে।

---

*শিক্ষক, গণিত বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি কলেজ (বুয়েট ক্যাম্পাস), ঢাকা।

২৫ জুলাই, রাস্তায় মানুষ ও যানবাহন শূন্য। আমি বুক পেতে দাঁড়িয়ে ছবি তুলি- "বুক পেতেছি গুলি কর, বুকের ভিতর ভীষণ ঝড়"। এই ছবিটি সামাজিক মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

২৬ জুলাই, বড় ভাই প্রফেসর ডক্টর কাশেম ভাই, বাবা-মা আমার ছবিটি দেখে শঙ্কিত হন। বন্ধু-বান্ধব খোঁজ খবর নিতে থাকেন। ফলে আমি আর পিছু হটতে পারি না।

২৯ জুলাই: রক্তে লেখা প্রতিবাদ

সেদিন আমরা যাত্রাবাড়ীর একটি সড়ক সম্পূর্ণ অবরোধ করি। পুলিশের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে কিছু মানুষ গুলিবিদ্ধ হন, কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেন। রাজপথ রঞ্জিত হয় রক্তে।

৩০ জুলাই: একটি শিশু, একটি স্লোগান

সেদিন আমি আমার তিন বছরের ছেলে আয়ানকে নিয়ে আন্দোলনে যাই। সে স্লোগান দেয়-একটা পবিত্র, নিষ্পাপ কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা। একসময় তাকে বাসায় রেখে আমি রাজপথে ফিরে যাই। বুকে বিশ্বাস ও পেছনে একটি বিদায়ের অনুভব।

৫ আগস্ট: মৃত্যু না মুক্তি

আগের রাতে বাবা ফোনে বললেন, "বাবা, কালকে বের হইও না।" আমি বলেছিলাম-"বাবা, ধরো তোমার একটা ছেলে মারা গেছে, কিন্তু সে ছাত্র-জনতার সাথে বেইমানি করেনি। আমার মৃত্যু হলেও তুমি গর্ব করে বেঁচে থাকতে পারবে "

ডিএমআরসির (আপন, নিরব ও সাজ্জাদ) ছাত্রদের সঙ্গে বসে আমি বাবার সঙ্গে লাউডস্পিকারে কথা বলি। হয়তো আমার কথাগুলো কারো কাছে পাগলামি লাগতে পারে, কিন্তু আমি জানতাম-এই দেশটা পাগলদেরই জন্য স্বাধীন হয়েছে। স্বৈরাচারমুক্ত হয়েছে। পাগল না হলে কি কেউ মৃত্যুর মিছিলে যায়? যেতে পারবে?

সকালবেলায় আমরা মিছিল নিয়ে কাজলা মোড় অতিক্রম করি। গুলিবর্ষণ শুরু হয়। আমার পাশেই একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে। তাকে মসজিদের পাশে রেখে চিকিৎসা দিই। এরপর আমরা যাত্রাবাড়ী থানা ঘেরাও করি। গুঞ্জন ওঠে-সেনাবাহিনী গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

হঠাৎ করেই ছড়িয়ে পড়ে- "শেখ হাসিনা পালিয়েছে"। আমাদের মিছিল ছড়িয়ে পড়ে পুরো শহরে। শাহবাগে বিজয়ের আনন্দে সবাই উচ্ছ্বসিত। আমি জানি, এই ইতিহাস কেউ সহজে ভুলবে না।

শেষ কথা:

যে আগুন এক শিক্ষক জ্বালিয়ে ছিলেন...

আমি তখনো শিক্ষক ছিলাম, এখনো আছি। তবে সেই আন্দোলনের সময় আমি কেবল গণিত শেখাইনি, আমি শিখেছি ও শিখিয়েছি- ন্যায় কী? অন্যায় কী? ভয়কে কীভাবে অতিক্রম করতে হয়।

আমার চোখে আন্দোলন মানে কেবল ব্যানার, মিছিল নয়-এটি একটি আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া, যেখানে তুমি নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য দাঁড়াও।আমি গর্বিত, আমি ছাত্রদের পক্ষে ছিলাম। হয়তো এই গর্বই আমার সবচেয়ে বড় অর্জন।

জুলাই আন্দোলন যেভাবে ১৮৫৭-১৯৭১ এর প্রতিটি ঘটনার প্রতিচ্ছবি

রিশাদ নূর*

আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তকে সকল আন্দোলনকে মহিমান্বিত করা হয়। আপনি দেখবেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ এর আন্দোলন ও সেই সাথে ১৯৪৭-১৯৭১ এর মধ্যকার আন্দোলনগুলোকে ভীষণভাবে মহিমান্বিত করা হয়েছে। প্রচুর নাটক সিনেমা বানানো হয়েছে। এদেশের প্রতিটা সচেতন নাগরিক কখনো সেই গল্প পড়ে ক্ষুদিরাম হতে চেয়েছে, কখনো মাস্টারদা সূর্যসেন হতে চেয়েছে কখনো বা হতে চেয়েছে রফিক জব্বার। আমাদেরকে শেখানো হয় এই উপমহাদেশে যখনি কোনো পরাধীনতা বা শোষণ আসে, তখনি জান দিয়ে আমরা সেটা রক্ষা করি। এভাবে আমাদের রক্তে আন্দোলন ঢুকে থাকে আর থাকবেও। এদেশের মানুষের মতো প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে খুব কম জাতিকে পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়েছে।

তাই পুরো জুলাই আন্দোলনে আন্দোলনগুলোর প্যাটার্ন কখনো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সাথে মিলে যায়, কখনো বা পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণবিরোধী আন্দোলনের সাথে মিলে যায়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন বলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, তখন পুরো ছাত্রসমাজ এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করে। মিছিলে গুলি খায়। রাতের আঁধারে নিহতদের শোকে ছাত্ররা স্মৃতিস্তম্ভ বানায়, সাথে আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক যেন জুলাই যেন এর প্রতিচ্ছবি, সরকার প্রধান শেখ হাসিনা সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের থেকে কোটা বহাল রাখার বক্তব্য এলো, ছাত্রসমাজ তখন মেনে নেয়নি, শুরু হলো মিছিল মিটিং আন্দোলন। গুলি চালিয়েও থামানো গেল না। ১৯৭১ এর মত কারফিউ জারি করেও থামানো যায়নি কিছুই।

এখানেই শেষ হয়। প্রতিচ্ছবি আরও অনেক। এই যেমন দেখেন সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল কীভাবে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন বন্ধ দিল, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ দিল, তখন দেশের আনাচেকানাচে এই শিক্ষার্থীরা গিয়ে নিজ এলাকায় এলাকায় আন্দোলন গড়ে তোলে। ঠিক যেন জুলাই এর ঘটনা। জুলাইয়ে ধীরে ধীরে সব বিশ্ববিদ্যালয় যখন বন্ধ দিল, সকল শিক্ষার্থী গ্রামে চলে গেল। সেখানে গিয়ে মানুষকে বোঝালো যে, কেন তাদের আন্দোলন, কেন ভাইয়ের রক্তের বদলা চাই, কেনই বা আমরা আন্দোলন করে এর সঠিক বিচার করতে পারব? এলাকায় এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তুলল। ধীরে ধীরে আন্দোলন গড়ে উঠল। সরকারকে যেখানে রংপুর, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রামকে সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছিল। পরবর্তীতে সারা বাংলাদেশকে সামলাতে হচ্ছিল।

মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারদের কথা মনে আছে? আমি সবসময় ভাবতাম এরা তো বাংলাদেশি। এরা বাংলাদেশের ভাল চায়, এরা কেন পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে বাংলার মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে? এর উত্তরও পেয়েছিলাম এই জুলাই আন্দোলনে। যখন সবাই কোটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তখন ছাত্রলীগ তাদের ভাইদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালিয়েছে, রাজাকারদের মতো গ্রামের অলিতে গলিতে পুলিশ নিয়ে গিয়েছে, রাজাকারদের মত পুলিশদের পাড়া মহল্লার রাস্তা চিনিয়ে বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিয়েছে। রাজাকাররা যেমন "দেশের ভালোর জন্য করেছি" জাস্টিফিকেশন দিত, ঠিক তেমন জাস্টিফিকেশন এরাও দিত।

---

* শিক্ষার্থী, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বেরোবি, রংপুর।

আমি আরও ভাবতাম যে, গান কবিতা কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অবদান রাখত? এটাও জুলাই আমাদের শিখিয়েছে । যখন পুলিশের ভয়ে, ছাত্রলীগের ভয়ে আমরা লুকিয়ে, ইন্টারনেট নেই, চারিদিকে শুধু গুলি আর আর্তনাদ, যখন জীবনের সাহস একদম মাটিতে, তখন "আমরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি/কারার ঐ লৌহ কপাট/তীরহারা এই ঢেউ এর সাগর পাড়ি দিবরে ..." গানগুলো অন্যরকম শক্তি এনে দিল শরীরে।

এরকম খুঁজলে আরও হাজারো প্যাটার্নের মিল পাওয়া যাবে। যেমন: মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাবা মাকে না জানিয়ে লুকিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়া, বাবা মায়ের আদুরে ছেলেটাও বিপ্লবী হয়ে উঠা, সেই ১৯৪৭ এর ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগানকে ধারণ করা, ১৯৭১ এর রেডিওতে কান দিয়ে সারাদিন বসে থেকে খবর শোনার মতো ফেসবুকে দেশের খোঁজ রাখা। সবকিছু যেন পুরনো গল্প নতুন কলমে লিখেছে কেউ।

ব্রিটিশদের হাতে ছিল রাইফেল, হাতে ছিল লাঠি। ওদের সামনে গেলে মৃত্যু নিশ্চিত, এর পরেও মিছিল নিয়ে গিয়েছিল মানুষ। যত মানুষকে অ্যারেস্ট করেছিল, তত মানুষ বিপ্লবের খাতায় নাম লিখিয়েছিল। এটাও জুলাইয়ে উঠে আসে। অস্ত্রের বিরুদ্ধে শুধু বজ্রমুষ্টি নিয়ে আর ব্যানার প্লাকার্ডে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মানুষ তখনো, এখনো। ১৯৭১ এ যেমন লুঙ্গি খুলে চেক চলত, এ সময়ে ফোন খুলে চেক হয়েছে। মানুষ আর্মির ভয়ে বাড়িতে থাকতে পারেনি। গল্প সব এক ।

ঠিক যেন খোদা সকলকে বাংলাদেশির শিকড়কে মনে করিয়ে দিলেন এই আন্দোলনে। আমরা অন্যায় সহ্য করিনি। এ দেশটা কারো বাপের না। এ দেশটা আমাদের। এই আন্দোলনে জীবিত হয়েছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেন, সাথে নূরুলদীন, নূর হোসেন, রফিক জব্বারসহ সকলে। আমরা আসলেই ফাল্‌গুনে দ্বিগুণ থেকে বহুগুণ হয়েছি, জেলখানায় জায়গা দিতে পারেনি, এত মানুষ নির্ভয়ে আন্দোলন করেছিল। তাই বলেছিলাম প্রথমেই, জুলাই আন্দোলন এদেশের মানুষের রক্তে মিশে ছিল। সেটা বহু আগে থেকেই। জুলাই যেন ১৮৫৭-১৯৭১ এর প্রতিটি ঘটনার প্রতিচ্ছবি।

আবু সাঈদের সাহসের আলোয় আমার যাত্রা

মুহাইমিনুন তাজবীদ নাবা*

ফ্যাসিজম, গণঅভ্যুত্থান, কমপ্লিট শাটডাউন, বাংলা ব্লকেড-শব্দগুলো যখন বইয়ের পাতায় পড়তাম, তখন মনে হতো এগুলো বড় কোনো ইতিহাসের অংশ। কিন্তু ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই শব্দগুলোর অর্থ নিজ চোখে দেখেছি ও নিজ হৃদয়ে অনুভব করেছি। একটি জাতির সবচেয়ে বড় শক্তি তার যুবসমাজ। ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই আন্দোলনে আমরা সেই শক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখেছি-সাহস, ঐক্য আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার অদম্য শক্তি। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর শুধু একটা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই নয়, এটি এখন সংগ্রামের প্রতীক। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় নামটি উচ্চারণ করলে আমাদের চোখের সামনে ভেসে আসে উপমহাদেশের নারীজাগরণের অগ্রদূত, মহীয়সী নারী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। যিনি সমাজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, নারীর অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করেছেন। ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ জুলাই মাসে ঘটে যাওয়া এক অভাবনীয় ঘটনার মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয় আবারো নতুনভাবে ইতিহাসে স্থান করে নেয়। ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই আন্দোলনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ অদম্য সাহস দেখিয়েছে, যা গোটা জাতিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তার এই সাহসিকতা প্রমাণ করে, বেগম রোকেয়ার উত্তরসূরিরা এখনো সমাজ পরিবর্তনে অগ্রনায়ক।

সময়টা ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাস। সবেমাত্র ভর্তি পরীক্ষা যুদ্ধ শেষ করলাম। এই মাস আমার জীবনে এক আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। জানতে পারলাম আমি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। স্বপ্ন পূরণের এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। কখনো নাটক, কখনো উপন্যাস ও খবরের কাগজ পড়ে নিজের মতন করে সময় পার করি। কিন্তু এই আনন্দের সময়টাতে হঠাৎ চোখে পড়ে এক সংবাদপত্রের শিরোনাম-'সরকার ২০১৮ সালের কোটা বাতিল' করে নতুন নিয়োগবিধি জারি করেছে।

এর ফলে সরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে। তারা ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের কোটা বাতিল করে দেওয়ার পরিপত্র পুনর্বহলের দাবি জানায়। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হলো। নিজের জানার আগ্রহ বাড়ে, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের কোটা আন্দোলন নিয়ে। ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের কোটা আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন আর্টিকেল পড়া শুরু করি। পরে জানলাম, সরকারের এ সিদ্ধান্তের ফলে আবারো বিতর্কিত কোটাব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে যা মেধা, প্রতিযোগিতা আর যোগ্যতাকে সরিয়ে দিয়ে বৈষম্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এরই মধ্যে দেশের পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করে। খবর আসতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করা হচ্ছে। আমি তখনও দর্শক ছিলাম। দর্শকের মতো প্রতিদিন খবর দেখি। ১৬ই জুলাই সম্ভবত দুপুর তিনটা অথবা সাড়ে তিনটা বাজবে। ফেসবুকে খবর পাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে। হঠাৎ থমকে যাই। বারবার ছবিটি দেখি। আবু সাঈদ একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া তরুণ, যে আমার মতো স্বপ্ন দেখেছিল, যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল।

রাতে ঘুমোতে পারিনি। চোখ বন্ধ করলেই শুধু আবু সাঈদের মুখ ভেসে ওঠে। একটা অদ্ভুত শূন্যতা আর কষ্ট ঘিরে ধরে আমাকে। যে ছেলেটি দেশের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিল- সে আর

---

*শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, ১৬তম আবর্তন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

নেই!আমি ভাবি আমি কি তাহলে চুপ করে থাকব? সে রাতে আমি সিদ্ধান্ত নিই আমি আন্দোলনে যাব।

ভয়ের মধ্যে সকালে বের হলাম। কাঁধে ব্যাগ, মুখে মাস্ক এবং হাতে পানির বোতল। আন্দোলনে আমি হেঁটেছি শত শত মানুষের সঙ্গে। প্রতিবাদের গান ধরেছি, প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়েছি, বৃষ্টি ও রোদ উপেক্ষা করে দিয়েছি স্লোগান-"আসছে ফাল্গুন আমরা হবো দ্বিগুণ"। "আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম"।

চারপাশে অপরিচিত মানুষের ভিড়, কিন্তু সবার চোখে ছিল আমার চোখের মতো ক্ষোভ, দুঃখ আর সাহস। সাধারণ মানুষ আর ঘরে থাকতে পারে না। তারাও দলবদ্ধভাবে আন্দোলনে যোগ দেয়। একসময় ছাত্রদের আন্দোলন হয়ে ওঠে জনগণের আন্দোলন।

সময় যেতে থাকে, জুলাই থেকে আগস্ট মাস চলে আসে। কোটাসংস্কার হলো, সরকার পরিবর্তন হলো, এদিকে আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুরু হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর চারপাশে অনেক নতুন মুখ, নতুন ক্লাস ও নতুন জীবন। কিন্তু আমার চোখের সামনে বারবার ভেসে ওঠে আবু সাঈদের মুখ। তার প্রতিবাদ, তার চিৎকার, তার নির্ভীক অবস্থান যেন আমাকে তাড়া করে ফিরছে। সবকিছুর ভেতর থেকেও আমি অনুভব করছি-আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে আছি তার কারণেই।

আজও যখন ক্লাসে বসি, ক্যাম্পাসে হাঁটি এবং আবু সাঈদের সাহসের আলো আমাকে পথ দেখায়। মনে হয়, আমি একা নই-আমার পাশে আছে হাজারো ছাত্র, আর আছে একজন আবু সাঈদ যার সাহস আমার যাত্রাকে আলোকিত করে চলছে।

স্মৃতিতে জুলাই
আতিকা বানু উর্মি*

আমি প্রথম থেকেই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। তবে বাংলা ব্লকেডের দিন থেকে আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ি। এর কারণ আমরা মধ্যবিত্ত পরিবার। মধ্যবিত্ত পরিবারের মূল লক্ষ্য পড়াশোনা শেষ করার পর একটা সরকারি চাকরি। সেখানে এত এত বৈষম্য, তাহলে তো চাকরি সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ভাই-বোন চোখেমুখে স্বপ্ন নিয়ে রাতদিন লাইব্রেরিতে পড়ে থাকে। এভাবে কোটা সিস্টেম চালু থাকলে তারা স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে না। কৃষক বাবার রক্তজল করে টাকা দিয়ে পড়াশোনা প্রায় সবার।

ক্যাম্পাসের কিছু সিনিয়র-জুনিয়রের তত্ত্বাবধানে প্রথম আন্দোলন শুরু হয়। হলের মেয়েরা তখনও আন্দোলনে সক্রিয় নয়। সাবিনা, অনন্যা ও হালিমা আপু সহ আমি হলের রুমে রুমে গিয়ে সবাইকে আন্দোলনে যাওয়ার জন্য বলতাম। তারপর হলের ডাইনিং-এর বেল বাজিয়ে সবাইকে ডাকতাম। এতে সাহায্য করতো হলের বান্ধবীরা যুথি, ইসরাত, রাফিয়া, আখি এবং আরও অনেকে (অনেকেই সাহায্য করেছে, নাম এখন মনে পড়ছে না)।এভাবে মেয়েদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। নারীশক্তির প্রকাশ এখানেই দেখা যায়। আমরা সাহস পাই এগিয়ে যাওয়ার।

জেলাপ্রশাসকের অফিসে স্মারকলিপি জমা দিতে যাই সবাই মিলে। সেদিন সাঈদ ভাইরাও ছিল, স্মারকলিপি জমা দেওয়ার আগে কিছু ছবি তুলি, সেসব এখন স্মৃতি। জেলাপ্রশাসক আমাদের অপেক্ষা করাচ্ছিল মিটিংয়ের দোহাই দিয়ে। আমরা ২-৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করি। অবশেষে স্মারকলিপি জমা দেই। অফিসের বারান্দায় একজন এনএসআই আমাদের সবার তথ্য নিচ্ছিল। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম, এই বুঝি বাড়ি পর্যন্ত খবর চলে যায়। তবে ভিতরে সাহস সঞ্চয় করি- আমার একার জন্য নয়, সবার জন্য লড়ছি, এটা ভেবেই শান্তি পাচ্ছিলাম।

তারপর ১৫ জুলাই। ঠিক করা হয় রংপুর শহরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিলে বড় মিছিল বের হবে ১৬ তারিখ। পরিকল্পনা অনুযায়ী সব ঠিক হয়। ১৬ তারিখ সকালে হলের মেয়েদের একত্র করি, আগের রাতে সবাই মিলে প্ল্যাকার্ড লিখেছিলাম, সেগুলো হাতে নিয়ে বের হই। তারপর আলাদা আলাদা হয়ে লালবাগের দিকে রওনা হই। কারণ ছাত্রলীগ পথে বাধা দিচ্ছিল। লালবাগ থেকে খামার মোড়ে যাই। শাপলা থেকে খামার মোড়ের দিকে মিছিল এগিয়ে আসছিল, আমরা সেখানে যোগ দেই। মিছিল এগিয়ে আসে পার্ক মোড়ের দিকে। সামনে ব্যানার ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা মেয়েরা। আমাদের লক্ষ্য ছিল ক্যাম্পাসে প্রবেশ করা, যে ক্যাম্পাসে আগের দিন আমাদের ভাইদের গায়ে হাত তোলা হয়েছিল।

পুলিশি বাধা শুরু হয়। আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম টগবগে তরুণ-তরুণী। বাধা মানব না। কিন্তু পুলিশ প্রথমেই ককটেল নিক্ষেপ করে। মেয়েরা সামনে থাকায় অনেকের চোখে ধোঁয়া লাগে। আমারও চোখে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সর্দার পাড়া মুখে দৌড়াতে শুরু করি। শ্যামাসুন্দরী খালের পাড়ে দোকানগুলোর পেছনে আটকে পরি কয়েকজন। বের হওয়ার পথ পাচ্ছিলাম না। পরে এক ভাইয়া গ্রীলটা কীভাবে যেন ধাক্কা মেরে আলগা করে ফেলেন, আমরা বের হয়ে মর্ডানের দিকে দৌড়াতে থাকি। হাঁপাচ্ছিলাম, ভাবছিলাম আর হয়তো রুমে ফিরতে পারব না। ঠিক তখন হাঁটুতে একটি

---

*শিক্ষার্থী,বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

ককটেল এসে পড়ে। কান্না করছিলাম আর দৌড়াচ্ছিলাম। ক্যাডেট কলেজের বিপরীতে একটি কোচিং সেন্টারে ঢুকেপড়ি।

ভিতরে পুরো হতাশায় শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম, কী হবে জানি না। ঠিক তখন দেখি হাওয়া আপু, রুপিয়া আপু ও সাবিনা আপুদেরকে দেখে শান্তি লাগছিল, আপনজন আছে। পাশের রুমে একজন আন্টি ছিলেন, যিনি মেসে কাজ করেন। তিনি আমাদের চা আর ভাজা চাল দেন। কোচিং সেন্টারের ভাইও আমাদের অনেক সাহায্য করেন। ওনাদের সারাজীবন মনে থাকবে।

ওখানে ঢোকার এক ঘণ্টা পর সাঈদ ভাইয়ের মৃত্যুর খবর আসে। সবাই চিৎকার করে কান্না শুরু করে। একটু আগেই যে মানুষটা আমাদের সাহস দিচ্ছিলেন। ভাইয়ের মুখটা বারবার মনে আসছিল। বাড়িতে খবর পৌঁছায়, আমাকে খোঁজা শুরু হয়। আমি যখন বের হই, তখন ফোন রেখে গিয়েছিলাম। আমার কোনো খোঁজ না পেয়ে সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে। অবশেষে এক ম্যামের মাধ্যমে আমাকে খুঁজে পান আমার চাচি। হাওয়া আপুর ফোনে একের পর এক কল। মা ফোনে কান্নায় ভেঙে পড়েন। সবার মুখ দেখতে মন চাচ্ছিল। ভেবেছিলাম হয়তো আর কারো মুখ দেখা হবে না।

আজও এসব লিখতে গিয়ে চোখে পানি চলে আসে। সব স্মৃতি বিস্তারিত লিখব একদিন। বিকেলে বের হয়ে দেখি পুরো শহর যেন শোকে স্তব্ধ। হলে ফেরার পথ পাই না। হাওয়া আপুর সাথে রবিন ভাইয়ের বাসায় যাই। সারারাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেই। ১৭ তারিখ সকাল ১০টার মধ্যে হল ত্যাগের নোটিশ আসে। ফোনে দেখি প্রায় ২০০+ (দুইশত) মিসড কল। সব গুছিয়ে ফুফির বাসায় যাই। তারপর গ্রামের বাড়ি চলে যাই।

পরে গাইবান্ধাতে আন্দোলনে অংশ নিই। সব কাজিন মিলে আন্দোলনে যাই। অবস্থা খারাপ দেখে হাসপাতালে যাই, যদি রক্তের প্রয়োজন পড়ে। আমি আর জান্নাতি মিলে ছোটাছুটি করছিলাম, স্যালাইন দিচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার চাচাতো ভাই বাঁধনকে রিকশা থেকে নামানো হচ্ছে, চিৎকার করে উঠি। ওর রাবার বুলেট লেগেছিল। কিছুদিনে সেরে ওঠে।

তারপর নেটওয়ার্ক বন্ধ, বাড়িতে বসে অস্থিরতায় কাটানো। অবশেষে ৫ তারিখ বিজয় নিয়ে এলো। এ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। মনে হয়েছিল বন্দি মানুষের খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছে কেউ। অনেক ভাইয়ের রক্তের বিনিময়ে এ বিজয়। সাঈদ ভাইয়ের কথা বারবার মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, "তোমরা সামনে থাকো বোন, তোমার ভাইরা পাশে আছে, ভয় পেও না।"

১৭ আগস্ট যমুনাতে একটি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম "আন্দোলনের রাজপথের অগ্নিকন্যা" শিরোনামে। কাঁদতে কাঁদতে ভাবছিলাম সাঈদ ভাই ও আরও অনেক ভাইয়ের শহিদ হওয়ার বিনিময়ে এই স্বাধীনতা। আপনারা আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু আপনাদের অনুপ্রেরণা নিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

আপনারা আমাদের হৃদয়ে অমর। আল্লাহ আপনাদের জান্নাতবাসী করুন।

A Remembrance of Shaheed Abu Sayed

Asif Al Matin*

Today, as we stand a year on from a pivotal moment in Bangladesh's history, we pause to remember **MartyrAbu Sayed**, the first martyr of July 2024. On July 16, 2024, in Rangpur, Abu Sayed Miah, a student of the Department of English, Begum Rokeya University, was brutally killed by police during the quota reform movement. His death, while he peacefully protested, ignited a nationwide outpouring of grief and outrage, becoming a catalyst for the broader "July Revolution."

Shaheed Abu Sayed was more than just a student; he was a symbol of courage and rebelliousness. He stood unarmed, with arms outstretched, embodying the aspirations of countless young Bangladeshis seeking justice and systemic change. His sacrifice, far from being in vain, galvanized a movement that ultimately reshaped the nation.

His memory lives on, not just in the hearts of his grieving family and friends, but in the collective consciousness of Bangladesh. The ParkMor intersection has been renamed "Shaheed Abu Sayed Chatwar" in his honor, and his image, often depicted with his chest outstretched in defiance, has become an enduring symbol of the uprising.

As we commemorate this day, we honor Abu Sayed's profound impact and the legacy of all who sacrificed during that turbulent July. His martyrdom serves as a constant reminder of the power of peaceful protest and the unwavering spirit of those who dream of a more just and equitable society. May his memory continue to inspire generations to come.

* Head of the Department, Department of English, Begum Rokeya University, Rangpur